KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৭ এ কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীট, কলকাতা-৫ (1/1 and 2) 19 Panditia Terrace, cal 29 (1/4 and 2/2)
Collection : KLMLGK	Publisher : বসন্ত কুমার (1/1 and 2) Sajal Banerjee, (1/4) Debkumar Bose (2/2)
Title : অনুভব (ANUBHV)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1/1 1/2 1/4 2/2 (SL. NO. 6)	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ (1966) March 1967 কার্তিক ১৩৭৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌরাংশু মৈত্র	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনুভব

৬

আধুনিক বাংলা কবিতার ত্রৈমাসিক

সম্পাদক ঃ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অনুভব

কবিতার ত্রৈমাসিক

৬

সম্পাদক ঃ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

অ্যাকাডেমিকা ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২

অনুভব দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা কার্তিক ১৩৭৪
দাম ২·৫০

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস কলকাতা-২৯

মুদ্রাকর
টি. পান
রাখাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭৭এ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

প্রাপ্তিস্থান
সিগনেট বুক শপ কলকাতা-১২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র

সূচীপত্র

কুহক (দীর্ঘ কবিতা)। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ১০১
শব্দ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১০৪
কয়েকটি রুশ কবিতা। অনুবাদ : মণীন্দ্র রায় ১০৫
এখন এবং তারপর। দক্ষিণারঞ্জন বসু ১০৭
প্রস্তুতি (দীর্ঘ কবিতা)। বাসুদেব দেব ১০৮
একটি মধ্যযুগীয় প্রশ্ন। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ১১১
জলছাত। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ১১২
বনজ্যোৎস্না। চিন্ময় গুহঠাকুরতা ১১২
ব্রাজিল। কুশল মিত্র ১১৩
সন্ন্যাস। কালীকৃষ্ণ গুহ ১১৪
সাথী। সুদর্শন রায়চৌধুরী ১১৪
ফলের কুঞ্জ, বর্ষা। সুকুমার ঘোষ ১১৫
প্রকৃতি, ঘনমায়া। সুনীলকুমার নন্দী ১১৬
এখানে নিঃশব্দ তুমি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১২০
আগুনের বাসিন্দা। পবিত্র মুখোপাধ্যায় ১২১
কু-ক্লুকস : ল্যাংস্টন হিউজ। অনুবাদ : গণেশ বসু ১২৩
পরবাসী পরবাসী পরবাসী (দীর্ঘ কবিতা)। সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪
ঘাতক : জুডিথ রাইট। অনুবাদ : সামসুল হক ১২৭
দেওয়ালে ছায়ার দিকে। শিবেন চট্টোপাধ্যায় ১২৮
ঘরবাড়ি ইমারত (দীর্ঘ কবিতা)। নিখিলকুমার নন্দী ১২৯
পতন ! পতন ! (দীর্ঘ কবিতা)। তুলসী মুখোপাধ্যায় ১৩১
অপার দুঃখের স্রোতে চক্ষু যায়। রণজিৎ দেব ১৩৩
সত্য। গৌতম মুখোপাধ্যায় ১৩৪
শরবিদ্ধ। রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক ১৩৫
শব্দময় দৃশ্যপটে। অমিত গুপ্ত ১৩৫
রোগশয্যায়। স্বপনকুমার গুপ্ত ১৩৬
মুগ্ধ একা ঘরে ভয়। আশিস সেনগুপ্ত ১৩৬
দুপুর গড়িয়ে ক্রমশ বিকেল। অনিল আচার্য ১৩৭
এই কলকাতা। সন্তোষকুমার অধিকারী ১৩৮
একদিক : অন্যদিক। তারক দত্ত ১৩৯
নির্বাসনে। নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ১৪০

অপরাবিদ্যা। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৪১
পবিত্র বিধান : গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্রাল। অনুবাদ : নচিকেতা ভরদ্বাজ ১৪২
বুকে রইল না স্পষ্ট কিছুই। শুভঙ্কর ঘোষ ১৪৩
বৃষ্টির স্বাদ। আশিস সান্যাল ১৪৪
নিজস্ব। তপনলাল ধর ১৪৪
চেতনা নিবিড়। অতীন্দ্রিয় পাঠক ১৪৫
দ্বিতীয় অন্তর। বিজয়কুমার দত্ত ১৪৬
বস্তুর আলেখ্য। মানস রায়চৌধুরী ১৪৭
পাঞ্চালীর শেষ লজ্জা কৌরব সভায়। অরুণাভ দাশগুপ্ত ১৪৮
ক্লীবের সংসারে এসে (দীর্ঘ কবিতা)। অমিতাভ দাশগুপ্ত ১৪৯
শোক। মৃণাল বসুচৌধুরী ১৫১
যৌবনোত্তর। শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৫২
শোক। রত্নেশ্বর হাজরা ১৫২
বাদর মেয়ে রাত ভরে কাল। স্বদেশরঞ্জন দত্ত ১৫৩
অহংকার। শুভাশিস গোস্বামী ১৫৩
মাছ মুরগী মানুষ ও পদ্মফুল। বিকাশ বসু ১৫৪
শেষ দৃশ্যপট। মৃণাল দত্ত ১৫৫
যেন সেই তো আমার স্বভাব। মদনমোহন বিশ্বাস ১৫৫
প্রভুর প্রতি নিবেদন। শংকর চট্টোপাধ্যায় ১৫৬
'এখানে আমি' প্রসঙ্গে (আলোচনা)। পরেশ মণ্ডল ১৫৭
কবিতাবলী (পনেরটি কবিতা)। গৌরাঙ্গ ভৌমিক ১৬২
সাড়া দাও। তুষার রায় ১৬৮
ছুটি কবিতা। সত্যেন্দ্র আচার্য ১৬৯
বলেছিলে। শ্যাম রায় ১৭০
অনুভব সূক্তাবলি। বঙ্কিম মাহাত ১৭১
ঘেরাও, কেবল ঘেরাও। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭২
সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা। মুকুল গুহ ১৭৩
বাজার ভেঙে গেলে। কৃষ্ণ সাধন নন্দী ১৭৩
আধ ও আধ পাগলা ছেলেটি। ক্ষিতীশ দেবশিকদার ১৭৪
আমায় কবি হতে দাও। শম্ভু রক্ষিত ১৭৫
কবিতাবলী। কৃষ্ণ ধর ১৭৭
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা (আলোচনা) পরিমল চক্রবর্তী ১৮৭
কবিতাবলী ১৯৩
[সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সত্য গুহ, পরেশ মণ্ডল, শংকর দে]
ডাক দিলে তুমি। শান্তিকুমার ঘোষ ২৪১
কালো পাথর। অঞ্জন কর ২৪১

কুহক

.....

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সূর্যাস্তে নীলিমা মধ্যে ফের সেই বিড়ালীকে দেখিতেছি।
আমি এই বিড়ালীর সঙ্গে কাল সারারাত…
আমি এই বিড়ালীর অভ্যাসবশত তাহার সহিত
গতকাল যথারীতি সারারাত খেলা করিয়াছি।

আজ বৈকালের পর এখন গোধূলিকালে পুনর্বার তাকে
দেখিতেছি—নিদ্রার বয়ান জুড়ে স্বাস্থ্যল সর্বাঙ্গে তার
কোমলতাগুলি
ঘুমায়ে রয়েছে শ্লথ আলস্যের ভারে
ঐ প্রদোষ আকাশে।
এবং পুনর্বার সারারাত দীর্ঘ রজনীর খেলা খেলিবার তরে
ফুটিয়া উঠিছে ক্রমে যুগল ওষ্ঠের নিম্নে
নরম গহ্বরে
ভয়ংকর জৈব তীক্ষ্ণ শানিত দাঁতের ঈর্ষা, ক্ষিপ্র হিংসাগুলি।
আমি এই বিড়ালীকে চিনি। তার তুলকালাম জাগর রজনী
আমারে খেলাবে ফের আজ রাত্রে, আমি আজ আবার আবার
সমুদ্রে জ্যোৎস্নায় মাঠে সারারাতব্যাপী পর পর বহুবার
বিস্ফোরিত রয়ে যাব অফুরাণ ঢেউয়ের তাড়সে।
কিয়ৎকাল তরে আমাকে বিধ্বস্ত করি সুক্ষতম অস্ত্রোপচারে
আমার উজ্জ্বলতম অঙ্গে এই বিড়ালীর নখ দাঁত চতুষ্টয় থাবার প্রবেশ
আমারে শায়িত, নষ্ট, পর্যুদস্ত সংজ্ঞাহীন রাখি
সঠিক চলিয়া যাবে গুপ্তউচাটনে তার নিজস্ব আঁধারে,
অতিকায় মায়াবী রমনীরূপ রূপান্তরে
অনন্তে চলিয়া যাবে—শব্দহীন মহাবিড়ালীর মত
অলৌকিক ধূর্ত ছদ্মবেশে।
আমার এ প্রাকৃতিক জ্বর আজ বহুকাল ধরি
সন্ধ্যার সময় আসিতেছে…

সারারাত একটানা জ্বর আসে ক্রমান্বয়ে মৃদু নিষ্পেষণে
সারারাত কুয়াশায় শহরের এইপারে
সারারাত রিরংসায় ভীষণ অনন্যোপায়
ধর্ষিত হবার তরে অপেক্ষা করিতে আর ভালো লাগে নাক'।

অথচ গোধূলিকালে আমার রুধিরে জ্বর প্রতিদিন আসে—
বশীকরণের বেগে, তাহার নির্দেশে আমি জরাক্রান্ত থাকি।
এড়াতে পারি না এই মর্ষকামী মফস্বলদেশে
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আবর্জে-ওঠা নিরুপায় ইন্দ্রিয়তাড়িত ক্ষিপ্ত আঞ্চলিক
অন্ধ বৃক্ষ বনের কুহক
এড়াতে পারিনা আমি তাহার সে থাবার থেকে উত্থিত মাংসল
স্ফোটকের মত বলাৎকারে ঝাঁপানো উপর্যুপরি লবণ আঘাত।
শরীরে প্রধান কেন্দ্রে দাপানো বীর্যের তোড়ে
তিক্ততাপ গোপন চীৎকারে
ফেটে গলে যায় রিপু স্বৈরাচারী পুলকের সর্বোচ্চ শিখরে···

বাধ্যতই, আমি সেই বিড়ালীর কণ্ঠনালী কটিদেশ
দু'হাতে মন্থন-চাপে পিষ্ট করি
ক্ষণিক কঠিন আক্রমনে উজাড় করিয়া দিতে বাধ্য হই সর্বসঞ্জীবনী
বাধ্যত বমন করি অসহ্য অভ্যাসে অনিচ্ছুক রক্তমজ্জাগুলি
বাধ্যত ফোয়ারা ওড়ে শরীরের স্বাস্থ্যদণ্ড ছিঁড়ে ঐ বিড়ালীর
তৃষ্ণার চুমুকে সম্মোহনে।...
অতঃপর আমারে সে একা রাখি দু-পহর রাত্রে দূরে যায়
দূরে, শুধু শুনি, দূরত্বে জ্যোৎস্নায় ক্রমলীন জানোয়ারের
লুপ্তপ্রায় তৃপ্ত-হাস্যধ্বনি।
নির্জন নিশ্চুপ শীতে আশ্লেষের মোহকুয়াশায়
উপায়বিহীন পাতাগুলি শেষরাতে
ঝরিয়া পড়িতে থাকে ঝরে যায় কাতর শীতের পাতাগুলি
অন্তহীন শেষরাতে আর্দ্রম্লান ঘুমের ভিতরে।

ঐখানে বিড়ালীটি আবার এখন ঈষৎ বাঁকানো ভঙ্গি
শায়িতা রয়েছে।
এখন গোধূলিকালে পুষ্ট প্রিয় নধর পেটের পরে তার—
ব্রহ্মাণ্ডপাতাল জুড়ে মাখামাখি মোলায়েম মদির
লাল-লাল হাতের আদর রেখে অস্তসূর্য নেমে চলে গেছে
সমতল ক্রীড়াভূমি ছেড়ে।

সূর্যাস্তে নিলীমা মধ্যে ফের সেই বিড়ালীকে দেখিতেছি।
আজ বৈকালের পর এখন গোধূলিকালে পুনর্বার তাকে
দেখিতেছি—আমি এই বিড়ালীর সঙ্গে কাল সারারাত···
আমি এই বিড়ালীর অভ্যাসবশত কাল সারারাত
বাধ্যতই অনঙ্গের খেলা খেলিয়াছি। বাধ্যতই—বাধ্যতই, আতুর,
তথাপি
তাহার অভ্যাসে আমি অসাড় দৈহিক ক্রিয়া করিয়াছি।

এবার খেলিতে হবে, তারে, আজ রাত্রে শুধু আমার অভ্যাসে
আমি আজ সারারাত নতুন পিপাসু এক অতল নির্দেশে
আদিম নিষ্ঠায় নম্র, তাহারে ডাকিব বক্ষে আমার পুরুষকারে
স্বয়ং-সংকল্পিত সঙ্গমশয়নে,
আমি তার গর্ভে—শ্রোণীদেশে করায়ত্ত রমনী বা শিল্পের মতন
দীক্ষাগুলি প্রোথিত করিব—
লজ্জা প্রেম সৃষ্টিক্ষম জন্মের কোমল প্রজননে।

কাল সূর্যোদয়ে তার লাজবতী উর্বর শরীর
অফুরান উল্লোল উৎসারে অর্বুদ হাস্যের ছটা
খুলিবে বাতাসে,
দীর্ঘ দীর্ঘতম রাত্রি বিভাবরী যামিনীর শেষে
বিস্তর বৃক্ষের বাহু দেখিব হরিৎ রৌদ্রে দুলিতেছে স্বাধীন স্বরাট্।
এবং জ্যোৎস্নায় যেন দেখিব সে বিড়ালীর
সিক্তগৌর কুমারীভঙ্গিমা

মৌসুমীমৈথুনে লিপ্ত চন্দ্রাহত সমুদ্রের সজল বিবাহে।
পত্রভারে স্বাস্থ্যশ্যাম রসায়নে বনানীর মেঘার্দ্র মর্মরে
তখনই তো আমাদের উভয়ের বিশাল উদ্ধার।

অবক্ষয়ে ক্লান্ত নহি, জঘন্য রক্তিল কূট বিবরের
তিমিরবিলাস বুঝিনাক'
ভালোবাসি জীবন যৌবনযুদ্ধ, স্পুই যৌনধর্মাচারী শানিত সংবাদ।
বিড়ালী এবং আমি পরস্পর চক্ষের মুকুরে
দেখিতে চাহিনা আর, দেখিব না কোনো সর্বনাশ।

শব্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বালি ঝুমকো, হলুদ নাভি, শূন্য হাস্য
রুপালি ফল, নীল মিছিল, চিঁড়িক চক্ষু···

চিড়িক না সুখ? চিড়িক শব্দে ঢ্যাঁড়া বসালুম
রুপালি ফল, না রুপালি উরুত? দ্রিদিম জ্যোৎস্না
অমনি আমার বুকের মধ্যে ভয়ের ঘণ্টা, দ্রিদিম জ্যোৎস্না
লিখে ভয় হয়
দ্রিদিম না স্মৃতি? জ্যোৎস্না না জল? অথবা সাগর?
দ্রিদিম সাগর? ঠিক ঠিক ঠিক! নিরুপদ্রব। শূন্য হাস্য
কুনকি কাফেলা, হাতেম তামস, শালু পালু লুস্
তামস? আবার ভুলের শব্দ, ভয়ের শব্দ, (কাটতে কলম
থর থর করে)
তামসের চেয়ে প্রগাঢ় আমার গরিমার কাছে শূন্য হাস্য
অর্থের এত বিভ্রমে বহু অশ্রুবিন্দু, কুলুকুলু জল···

কুলুকুলু বড় মধুর শব্দ, মধুর তোমার শব্দে শব্দ
মন্দিরে বাজে দ্রিদিম ঘণ্টা, জ্যোৎস্না উধাও, তামস উধাও।

কয়েকটি রুশ কবিতা

অনুবাদ: মণীন্দ্র রায়

রূপকর্ম

নিকোলাই উশাকভ (১৮৯৯—)

যখন আকৃতি ঐ আঙুলে নিশ্‌পিশ জাগে, আর
যখন ঝর্ণার মতো অভিজ্ঞতা বেগে প্রবাহিত,
কুমোরের চাকা জুড়ে
তখন চালাও বিশ্ব ঘুরে ঘুরে
এই দিকে
এবং ওদিকে।
সংসার এখনো নয় পূর্ণরূপ, জানো,
যথাস্থানে হয়নি বসানো।
তাকে আজ পাদপীঠে বসাও, এবং অনিমিত,
মুখে তার দিনে রাতে দিতে থাকো চড়
যতক্ষণে কাদামাটি জড়
কল্পরূপে না হয় বিধৃত॥

প্রেমের কবিতা

স্তেপান শিপাচেভ (১৮৯৯—)

মূর্খ লোকই প্রেমের মধ্যে শান্তি খোঁজে,
মোটেই সেটা নেই সেখানে।
দেখা পেলেও ভরসা তাতে রাখতে নেই—
যদিও হয়তো দেখতে পাবে প্রেমে এমন বান এলো যে
মৃত্যুও তার পথ রুখতে ফিরল শেষে হার মেনেই।

কেউ কি ভালোবাসে তোমায়, নিয়েছে কি প্রেমের শপথ?
দুটি যুক্তি করব তবে সমর্পন—
অগোপন ও বিশ্বাসকে রেখো সেখানে স্থির জামানত।
ওদের ছাড়া আসবে হয়তো ঘোর হতাশাই,
যেমন আমি মনেপ্রাণেই বুঝছি এখন॥

আমি আজ আমি / সেমিয়ন কির্সানভ (১৯০৬—)

মৃত্যুর করি না গান,
গাই জীবনেরই জয়,
কেন—সে কারণগুলি বলে রাখি :
(কিন্তু হাসি নয়,
যেমন হাসেন ঐ
পরমাণু—পদার্থ তত্ত্বের সংঘে জ্ঞানীজন,
কিম্বা জ্যোতির্বিদ
যাঁদের দুচোখ সাটা মহাজাগতিক দূরবীনে)।
বিস্ময়টা নয়—ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী ;
কালপুরুষ,
অভিজিৎ,
বিশাখা ও উত্তরফাল্গুনী,
আর যতো নীহারিকা থেকে দূর নীহারিকা আছে।
বিস্ময় বরং—ট্যাক্সি, রেলগাড়ি, আর মানুষের চোখ,
এবং কোনায় তার রেখাগুলি।
বিস্ময়টা নয়—ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ড,
ঘুরছে, যাচ্ছে মিলিয়ে বুদ্বুদ।
বিস্ময় বরং—মানুষেরা ভাবতে পারছে,
এবং তাদের চিন্তা সব রন্ধ্রে আতিপাতি খোঁজে,
আর তাই দরজা ক্রমে মুক্ত উদ্ঘাটিত।
বিস্ময়—অনন্তকাল নয়।
বিস্ময়টা বরং—মাতৃত্ব ;
সবল দুহাতে যত্ন এবং আদর ;
রোগ থেকে শুশ্রূষায় আরোগ্যে ফেরানো।
বিস্ময়টা হাল—আবিষ্কার ;
বিজয়ীর দুরন্ত চিৎকার,
'মিলেছে !। পেয়েছি খুঁজে !'
বিস্ময় আসলে এই'
আমি আজ আমি ॥

এখন এবং তারপর

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কেমন যেন সাপের মতন।
সায়াহ্নের অস্থিরতা যন্ত্রণা-বিহ্বল,
বারান্দায় জড়োসরো ভীতত্রস্ত ছায়া ;
বিপজ্জনক বুঝি অন্যমনস্কতা !
নক্সালবাড়ির মেঘে বিদ্যুৎ চমক,
ক্ষয়ের বিস্বাদে নোনা প্রাচীন প্রাসাদ ;
উলঙ্গ সর্বাঙ্গ জুড়ে কলঙ্কিত ক্ষত,
জঙ্গলে শিয়াল-কান্না প্রান্তরে শকুন।
গৌতমের শেষ-শয্যা শালতরু বনে—
অপ্রমত্ত দৃঢ়ঘনা হবার নির্দেশ,
সদর্থে জীবন। কিন্তু ব্যর্থ আর্তনাদ।
চাতক পাখির মতো পিপাসা-কাতর ;
জল চাই, জল !—তবু মৃত্যু অন্তরালে।
গ্রামকে যায়না জানা সহরের চোখে ;
এখন প্রতীক্ষা শুধু সুচিন্তিত রায়,
বিশুদ্ধ আলোর জন্যে কাতর প্রার্থনা।

একটি আবেদন

আপনি যদি কবি, কবিতার পাঠক কিংবা অনুরাগী হন, এবং যদি আপনার সামর্থ থাকে—তা হলে, দান গ্রহণ করার পূর্বে একবার কবিতা-পত্রিকাগুলো ক্রয়ের কথা ভাবুন। তাতে আপনার সামান্য অর্থব্যয় হলেও প্রকাশন-কর্তৃপক্ষের লোকসানের পরিমাণটা অনেকখানি কমে যায়।

প্রস্তুতি

বাসুদেব দেব

আমার শুধুই প্রস্তুত হয়ে থাকা
আমার শুধুই প্রস্তুত হতে থাকা
উলটে পড়া কলপের শিশি, আতর দানিটা
পড়ে যায় হাতে লেগে, সমস্ত ঘরেই
ভর করে অদ্ভুত মিশ্রিত গন্ধ। বাইরে ফটকে
মোটরের হর্ন বেজে যায়। অথচ বারান্দা থেকে সদর রাস্তায়
যেতে যেতে চলে যাবে গাড়ি। আমি দুঃখ না পেয়েই
দিব্যি এসে বসে থাকি তাকিয়া হেলান দিয়ে, আজ
কোথাও হলো না যাওয়া, ঘড়ি দেখা, জামা ইস্ত্রি করা—
তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পুড়ে যায় ঠোঁট, চলকে পড়ে চা—
আমার হয় না যাওয়া কোনখানে। সারাটা বিকাল
আমার প্রস্তুত হতে থাকা
আমার প্রস্তুত হতে থাকা

আমি এক দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য কেবলই প্রস্তুত হতে থাকি।
ভাঙা দরজা মেরামত করে চাবিওলা ডেকে চাবি গড়ি—
প্রতিবেশীদের বলি একটু নজর দিতে, সামান্য বাগান
ছাগলে মুড়িয়ে খেলে দুঃখ পাবো। লেটার বকসের চিঠিগুলি
সম্ভাব্য ঠিকানা মত যথাযথ পোষ্ট করা—এই সব
টুকিটাকি গোছাতে মনের এঞ্জিন ছুটে যায়—
কতো সূর্যোদয় কত নিশীথ রাত্রির নীরবতা ভেঙে শুধু সমুদ্র গর্জন—
ঝাউয়ের কানন ভরা জ্যোৎস্নার লুকোচুরি—গভীর জঙ্গলে
ফাঁকা গুলির আওয়াজ—পাখিদের ওড়াউড়ি—বাংলোবাড়ির
বারান্দায় কত পাখি—রোদ্দুরের ছউ নাচ নদীর ওপর—
কোন্‌খানে সূর্যাস্ত করুণ?
কোন্‌খানে রূপকথা বর্ণিত নারীর অমলিন প্রেম পোড়ে
ধূপের মতন চিরকাল? কোন্‌খানে দস্যু ঘাতকের

খড়্গ উঠেছিল ঝলে সন্ন্যাসীর শির লক্ষ্য করে?
আমার হয় না যাওয়া
কত ট্রেণ কত মাঠ পাড়ি দিয়ে চলে যায়
বুনো হাঁস উড়ে যায় শীতের উজ্জ্বল রৌদ্রে—
আমার টেবিলে
মৃত গঙ্গা-গোদাবরী, সমুদ্র পর্বত। কত সূর্যোদয়
কত উদ্ভাসিত বন জ্যোৎস্না, হলুদ কান্তার, কত বন, প্রাচীন মন্দির
আমাকে সাধতে থাকে: 'এসো এসো দয়াময়...
আমি এক বিজয়ীর মত
পা দোলাই, হে হৃদয়, কোন্‌খানে যাবো?
পিপাসার প্রত্যাশার নিরাময় আছে কোন্ দেশে?
কোনো পথ কোনো লক্ষ্যে বিশ্বাসী থাকে না—
বালবিধবার দীর্ঘ জীবনের মত বড়ো বেশী প্রবঞ্চনাময়—
ব্রিজ ভেঙে পড়ে যায়, দুর্ঘটনা বেড়ে চলে···ফাটল বোজাতে গিয়ে
নাকে চোখে জল, হরতাল দেশ জুড়ে।
আমার হয় না যাওয়া কোন দেশে
শুধুই প্রস্তুত হতে থাকা।

আমি এক দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য কেবলই প্রস্তুত হতে থাকি।
উপড়ে ফেলতে চাই ডাকঘর, অসংখ্য প্রণয়-লিপি খুলে যার পিওনেরা
পরিবর্তে অশ্লীল প্রস্তাব লিখে দুপুর বেলায়
কড়া নেড়ে ঘুম ভাঙিয়ে বিরহিনীদের হাতে গুজে দিয়ে আসে!
অথবা সেই যে সব রমণীরা—
বেনামীতে ভাড়া নিয়ে বহু ফ্লাটঘর যথেষ্ট সেলামি দিয়ে,
একই ঘর ভাড়া দেয় এক সঙ্গে ৬৪ যুবাকে—
তাদের উৎখাত করি, কিংবা কবিদের
মদ্যপাত্র কেড়ে নিয়ে শীতের রাত্তিরে
ফেলে রাখি খোলা মাঠে, ছেড়ে দিই বাদামি ভল্লুক—
ছিঁড়ে নিয়ে হৃদ্‌পিণ্ড, মুখোস, দস্তানা
জমা দিতে নিয়ে যাক মেলার সার্কাসে···
এ সবই সে সংগ্রামের কল্পিত খসড়া—

সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ :

অন্ন দাও বস্ত্র দাও···
মৃত্যুর বিরুদ্ধে লক্ষ রোগীর সংগ্রাম—
পাথরের বিরুদ্ধে নদীর।
খাঁচার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পাখি সমাজের...
কুয়াশা বিদীর্ণ করে পূর্ণিমার দৃপ্ত তীরন্দাজ
কেবলই আমাকে ডাকে—
আলোকের ছায়াহীন বন্যার ভিতর উৎসবের দিনে
সিঁড়িকোঠা ফিসফিস করে ডাকে ভীরু অন্ধকারে···
কত কথা ছিল আরও,···
এরকম স্বল্প দীর্ঘ সংগ্রাম আমাকে
কেবলই ডাকতে থাকে !
টোটা ভরে নিতে নিতে আমার পিস্তলে
আমি দেখি সমস্ত সংগ্রামই
অবশেষে এবং মূলত আমারই বিরুদ্ধে, আমাকেই লক্ষ্য করে।
তাই শুধুই বারুদ ছানা, সান্ দেওয়া, সাইরেন মহড়া—
সব আলো নিভিয়ে আপদ্‌কালে নিজের চীৎকার নিজে গিলে নিয়ে
আমার প্রস্তুত হতে থাকা।
আমার সংগ্রাম আর কোনদিন আরম্ভ হয় না।
বুকের খোদলভরা বিস্ফোরক, হায় টেরিলিন—
প্রতিরোমকূপে গন্ধকের কারখানা—কোনো নারী
আমাকে চুম্বন করে না যে, কাছে ডেকে নিয়ে
আমার কেবলই চলে যাওয়া—সংগ্রামের আগে ধ্বংস—
মৃত্যুর আগে পরাভব—ভ্রমণের আগেই আমার
সব ক্লান্তি—আমি এই সমগ্রজাতির
জরা নিয়ে পুরু আজ, হে যযাতি, দয়া করো—
যাও পাখি বলো তারে
আমি আজ মদ্যপান না করেই দারুন মাতাল—
আমি আজ না ছুঁয়েই
নষ্ট করে দিয়ে যাব পৃথিবীর সকল রমণী—
আমি আজ ভীষণ প্রস্তুত ॥

একটি মধ্যযুগীয় প্রশ্ন

.....

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সে সব আঁধার মধ্যযুগের বর্বর ইতিহাস।
আমাদের পূর্বপুরুষেরা
নিজের খেতের শস্য নিজের উটের পিঠে বেঁধে
সব্‌জি ফল স্বহস্তে প্রস্তুত মদ
স্বীয় রমনীটি সহ খচ্চরে আরূঢ়
দেশ দেশান্তর বেড়াতেন।

বৃহৎ শিল্পের নামে ক্রমশ সমস্ত মালিকানা
নিয়েছে সমাজ ;
আমার বাগান থেকে ফল সব্‌জি আজ
পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে তোমার টেবিলে।
তোমার মাঠের ধান
নগ্ন হয়ে তার শ্বেত সুন্দর শিশুর মতো দেহ
দেখিয়ে অন্যের কাছে সখ্য চায়, বলে,
'পরস্বাপহরণের মতন অর্জন আছে কিছু ?'

তোমার শ্রমের মূল্যে আমাদের স্বরচিত পাঁচখানা গ্রাম
হস্তান্তরিত, ফের কোনো বুদ্ধিমান শ্রমিকের
বেতন যোগাতে
হাজার শস্যের গোলা নিঃশেষ !···শিল্প হে,
সব একাকার করলে যদি উৎপাদনের উন্নতি
তবে মধ্যযুগীয় প্রথায়
রমনী রত্নকে কেন রেখে দিচ্ছ
ব্যক্তিগত সম্পদের মতো ?

জলছাত

প্রনবেন্দু দাশগুপ্ত

এভাবে কখনো হয় না। জলছাত
ঈশ্বরবিহীন প'ড়ে আছে।
আমার যা হাতে, তা কি নিঃশব্দ করাত—
পুরোটা লুটিয়ে পড়'লে দেখা যায়
ঘর ভেঙে গেছে?

এভাবে কখনো হয় না—
কিশোরসঙ্ঘের ছেলে, বল নিয়ে
ঘাসের ওপরে নড়ে চড়ে,
সচিত্র খবর ব'লে ফিরি হয় ঘৃণা ভালোবাসা
রং শুধু ঠোঁটার ওপরে।
তুমি কথা দাও, তুমি এইভাবে কাজ বাড়াবে না,
বিকেলে ঘুমের প'রে খুলে দেবে
জ্যোৎস্নার প্রপাত—

শুধু ঈশ্বরের স্মৃতি অবলুপ্ত ছাতের ওপারে!

বনজ্যোৎস্না

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

কখনো কী তুমি দেখেছ এমন জ্যোৎস্না
নির্জন বনভূমি,
নিবিড় শান্তি ক্রমে নেমে আসে কাছে
রাতের পাখিরা মুখোমুখি বসে আছে
এখানে এখনো কিছু প্রশান্তি আছে
যদি পারো, এসো তুমি
এখনো শিয়রে তন্দ্রাজড়িত জ্যোৎস্না।

পথ বলে দেবে নীলনির্জন অপরাজিতার লতা
নেই কোনো সংশয়,
নিবিড় রেখায় বনানী অলঙ্কৃত
কলকোলাহল বড়ো বেশি ছায়াবৃত
কর্মবিমুখ থেকে যদি হও প্রীত
চলে এসো নির্ভয়,
উত্তরবায়ু দোলায় হাজার অপরাজিতার লতা।

এখানে মুক্তি, শান্তি ছড়ানো আছে কবিতার মত
বনজ্যোস্নায়, তরু বীথিকায় সকলে চন্দ্রাহত।

ব্রাজিল

কুশল মিত্র

এক কাপ কফির পেয়ালা
হাতে তুলে দিয়ে পাওলো বললে—
"কেমন লাগছে বলো ব্রাজিলের কফি?
আমার দেশের।

জানো, আমার ভাইরা এই কফি ক্ষেতেই কাজ করে,
মরতে ওরা ভয় পায় না। ভয় ওদের—
শিশুর মত কফির চারাগুলোতে না এসে
বন্দুকের গুলি লাগে।

নিজের রক্তের চেয়েও ওরা
এই কফি গাছের গোটাগুলোকেই দেখতে ভালবাসে
ওরা জানে, ওদের রক্ত
আজ বা কাল সে
এই কফির মাঠেই ঝরে পড়বে
মালিকানা মিলিটারী
ওদের বন্দুকে তাজা কার্তুজ সর্বদাই ভরা থাকে।"

"বন্ধু বলো, কেমন লাগছে ব্রাজিলের কফি
আমার দেশের ?"
চমকে উঠি।
আমার ঠোঁটের সামনে টলোমলো দূরের মহাদেশ
এক কাপ তাজা রক্ত কেঁপে ওঠে
সুগন্ধ ধোঁয়ায় ভরা প্রাণ জুড়ানো সে কফির পেয়ালায়।

সন্ন্যাস

কালীকৃষ্ণ গুহ

ধুলোর ভিতর থেকে ফুল কুড়িয়ে নিয়েছি—এই অপরাধে
তুমি আমাকে বর্জন করেছো।

ধুলোর ভিতর থেকে ফুল কুড়িয়ে নিয়েছি—এই অপরাধে
ভেঙে পড়েছে মন্দিরের চূড়া।

তবু—
কেন আমি হাত বাড়িয়ে বলি, 'দান করো—
আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি—এই কথা ভেবে
আত্মদান করো ?'

কেন বলি ? এই কি সন্ন্যাস ?

সাথী

সুদর্শন রায়চৌধুরী

নিঃশ্বাসে তার ছিল না ফুলের গন্ধ
বিকালে যায় নি বুর্জোয়া এভিন্যু-এ
পলাশে ছিল না কোনদিন তার প্রীতি
হাতে হাত দিয়ে বলে নি সে প্রিয়তম,
'চৈত্র এসেছে, এবার ভাসাও তরী।'

উদাস বকুলে উধাও হয় নি মন
বাধাহীন বেগে ছোঁড়ে কি পুষ্পশর
কর্ণে দোলে নি যুথিকার মৃদু ফুল
চোখে চোখ রেখে বলে নি সে প্রিয়তম,
'দূরে স্বপ্নের দেশে চলো দিই পাড়ি।'

সে আমার মাঠে দুপুর বেলায় আসে
দূর গ্রাম থেকে রেঁধে বেড়ে ভাত নিয়ে,
সে আমার কলে দুপুরে বাজলে বাঁশী
ছুটে আসে ঠিক আঁচলে গুছিয়ে রুটি,
হাতে হাত রাখি, দুজনায় কাজ করি।

ফলের কুঞ্জ, বর্ষা

সুকুমার ঘোষ

ফলের কুঞ্জ ভ্যাপসা গরমে পচা,
বর্ষার দিনে দৈবকে দোষা ভুল,
পুরুষের শোকে রমনীর হাতে রচা
ভাষার ভিয়েন আমরুল জামরুল।

ফলসাই ভালো, কিম্বা হাতুড়ে মাছি,
পারাপারে যায় সবারই সন্ধ্যাবাতি,
শক্ত সুপুরি দুপুরের কাছাকাছি
মাড়ির স্বপ্নে খুলেছে লোহার জাতি।

ফলের কুঞ্জে সারামুখে খোঁচা খোঁচা
দাড়ি গোঁফ নিয়ে ফলগুলি কাচা ডাসা,
বর্ষার দিনে দৈব গর্ভ মোচা—
চাও বা না চাও বৃষ্টিতে বাজে কাঁসা।

চালতের রসে পিঁপড়ের কোরবান,
ফলের বসত কুঞ্জের সেরা ডালে ;
যার শোক বেশি তারই তো উপাধি ডা'ন
বর্ষার শিরা তখনি চুকোয় গালে।

মরামানুষের জ্যোস্নাকে বড়ো ভয়,
চিলের বাসায় বাড়ে শকুনের ছানা,
ফানুষ যখন করেছে আয়ুক্ষয়,
মেলুক স্বর্গে অবরোহনের ডানা।

ফলের কুঞ্জে বর্ষার কর্কচ—
শিকড়ে শুদ্ধ দৈবের খোলা মুঠ
বৃষ্টির পটে পড়ুক দু-এক পোঁচ,
শোকের আতপে তৃষ্ণা টানুক খুঁট ॥

প্রকৃতি, ঘনমায়া

(একটি কাশ্মীরী কবিতার ছায়ায়)

সুনীলকুমার নন্দী

রূপের আলুল তৃষ্ণা কত
বন্য এবং সুতীব্র :
বুকে বাঁধো চাঁদের আলো,
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পসাজ,
নীলাল আভায় শিশির-ঝিলিক
সবুজ ঘাসে শয্যা নাও,
লতাপাতার গুচ্ছে-ডোবা
গ্রীবায় মরাল ভঙ্গী দাও!

* * *

স্রোতস্বিনীর বুক-ছাপানো
ছল্‌ছলানো সঙ্গীতে
মনের গভীর-গহনতলে
কল্লোলিনী ঢেউ তোলে।
মামুলি এক দৃশ্যে যদি
পীড়িত হয় পথিক-চোখ,
ডিঙিয়ে শীতল ঊর্মিমালা
দূরদিগন্তে চোখ মেলাও…

চোখ মেলে দাও, জলে যে-মেঘ
কালো এবং সুশুভ্র
ফেলছে ছায়া. ওই মেঘলা ওড়না ওড়ায়
উধাও-নীল—
মেঘ যেন নয় প্রিয়ার কোমল শ্যামল অঙ্গ
ছড়িয়ে রয়
ঝলমলে যে-রেশমী শাড়ি, তারি উপর
চুলের ঢল।

বৃষ্টি-ভেজা ভর গোধূলির
বাউল আকাশ সপ্ত রঙে
রামধনুকে রাঙিয়ে দিয়ে
সূর্য নামে পাহাড় মালায় ;
নীল পাহাড়ের টিলায় টিলায়
কী বিচিত্র রঙের ছুট
চলছে…দেখো, ঘনমায়া
টানছে হৃদয়…অন্তলীন।

বাঁধন ছেড়া টানে টানে আলগা পায়ে পায়ে
আকুল চোখের অধিক নরম সবুজ ঢালা পথ—
আনলো কোন রহস্য কি পায়ের তলায় ঘাস—

স্পর্শে···তুমি নিজেই বোঝো, আমার অনুভব
পারে না আর ; আরে, আরে ডুবলো বুঝি দিন!

*　　*　　*

আকাঙ্ক্ষিত রাত্রি এলো, তমস্বিনী বঁধু—
অঙ্গে তারার চুমকি-তোলা কালো আকাশ-শাড়ি,
সঙ্গে এলো স্নিগ্ধ-নিবিড় স্বপ্ন অনুকূল।
রাত্রি নামের ধ্বনিতরঙ্গে আমার হৃদয়-স্পন্দনরোল
দ্রুত হয়, দ্রুত দ্রুতীব্রতর,
সুপ্তিমগ্ন স্বপ্ন চিন্তা জেগে ওঠে মনে—
কিন্তু দীর্ঘদিনের নিরালা হৃদয় কবে-না হারিয়ে ফেলেছে
স্বপ্নের দেশ...
শান্ত প্রকৃতি, খোলা কুন্তলে
থরো থরো থরো পুঞ্জ-আবেগে যে সাড়া তুলতো
আমার হৃদয়ে
সে-সাড়া আজ আর খুঁজে পাই কই!

ঘৃণা লোভ আশা ভয় ও বৈরী-ভালোবাসা সব
অসংখ্য ছায়া
আমাদের ম্লান দুপুর বিকেল সারাদিনমান
ঘিরে থাকে ; যেন
কালোছায়া মুছে শান্ত তামসী আনে আনন্দ অজানা
অপার

ওই তো রাত্রি বিস্তার করে স্বপ্ন, ঈগল পাখনার মতো
যে-দুঃখ থাকে মনের অতলে
তাকে তুলে আনে
সুজন নীলিমা, ছিঁড়ে ফেলে যত অবগুণ্ঠন—
জাগর নয়ন খুঁজে পায় পথ।
রাত্রি প্রেমের তাপস হৃদয়ে আনে সুতীব্র জ্বালা...
কম্পিত শিখা আতপ্ত কামনার—

ঘুমে ঢুলুঢুলু নগরী-শিয়রে গলিত চাঁদের আলো,
প্রেমিক, হৃদয় অঞ্জলি দেয় প্রেমে।

তুমি কি কখনো দেখেছো প্রভাত জাগা—
সুরু হয় যেই সূর্য-পরিক্রমা,
আকাশের নীলে শুভ্র পাহাড় চূড়া
স্নান করে যেন দীপ্ত অরুণরাগে।
শিথিল প্রণয় আবেশে আবীর ছুড়ে
মুকুরে কিরণ করে প্রতিবিম্বিত—
নয়ন-স্পর্শে রক্তে লাগায় দোলা,
আনত হৃদয় বিদ্ধ আলোর তীরে।

*　　*　　*

সৃষ্টি সুরু থেকে　　প্রকৃতি ঘনমায়া,
কবির বুকে বুকে　　দয়িত-ছায়াপাত
মরমী অনুরাগে　　ভাসালে অভিসার
রূপের রক্তিম　　ভুবন উঁকি দেয়।
প্রণয়ী বীথি মেয়ে　　উদাসী রূপসীর
ভুবনে প্রবেশিলে　　উতলা বিস্তার
রক্তে ধ্বনি তোলে　　বেদনামিশ্রিত
মধুর তীব্রতা　　যা স্মৃতি তুলে রাখে
সময় ছুঁয়ে ছুঁয়ে　　বুকের অনুভবে...

প্রকৃতি ঘনমায়া　　সুহৃদ, প্রিয়তম॥

কয়েকটি কবিতাপত্র

সীমান্ত (সম্পাদক : তরুণ সান্যাল, মৃগাঙ্ক রায়, প্রসূন বসু) শ্রুতি (সম্পাদক : পরেশ মণ্ডল ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায়) উত্তরসূরী (সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য) অলিন্দ (সম্পাদক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত) কৃত্তিবাস (সম্পাদক : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) কবি ও কবিতা (সম্পাদক : জগদীশ ভট্টাচার্য) পুনশ্চ (সম্পাদক : মৃণাল দত্ত) ক্রান্তদর্শী (সম্পাদক : অশোক দত্ত চৌধুরী) অক্ষিসূত্র (সম্পাদিকা : মমতা কোলে) ত্রিবৃত্ত (সম্পাদক : রণজিৎ দেব) কবিপত্র (সম্পাদক : পবিত্র মুখোপাধ্যায়)।

এখানে নিঃশব্দ তুমি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শাদা কাপাসের তৃষ্ণা, বনের আড়ালে
রঙের রোমাঞ্চ, দাগ···
নীল ছই, তাঁবু
টমটমের শব্দ হয় ঝুঁকে-পড়া শুকতারকায়!
এখানে নিঃশব্দ তুমি

সজারুর নৃত্যে কি তুফান?
রটনা নেহাৎ, অল্প; কর্মক্ষম চাবি
সিন্দুকের ডালা খোলে
দুঃখের মান্ধাতা, ফটোগ্রাফ...
অমূলতরুর ফুল
সবই কতো তুচ্ছ, মূল্যবান!
এখানে নিঃশব্দ তুমি

বড়োবাড়ি পাঁচিল রাখে না
হাট ভেঙ্গে পড়ে নদীতীর
পারঘাটা...
ছলাৎ ছলাৎ শব্দে কাছে এসে কুর্নিশ জানায়
ওপাড়ার লোকালয়
কিন্তু, তুমি কাপাসেরই কাছে...
রক্তের শপথে বন্দী

বনের আড়ালেদাগ
নীল ছই, তাঁবু
টমটমের শব্দ হয় ঝুঁকে পড়া শুকতারকায়!
এখানে নিঃশব্দ তুমি

আগুনের বাসিন্দা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

১

বুকের মধ্যে তোলপাড় করে সমুদ্র, পাহাড় উঠে মুখে
চিরহরিৎবৃক্ষের ছায়ার শাল গায়ে জড়িয়ে পাশমুক্ত হরিণ
সেই পাহাড় সেই অরণ্য সেই মরুভূমির
সন্ধান করে চলে
পায়ের ছাপ যেখানে শুধু পশুরই পড়ে
যুথবদ্ধ নয় তারা আত্মরক্ষায়
সব প্রাণীই যেখানে অবলোকিতেশ্বর আনন্দ
সব নদীই নৈরঞ্জনা
বৃক্ষমাত্রই বোধিদ্রুম

২

ভেঙে পড়েছে তোমার অনাহারক্লিষ্ট শরীর
মাটির বুকে হাড়ের ছায়া
সমুদ্রের ঢেউএর মতো যে হাড়গুলো
লাফিয়ে উঠতো
ভালোবাসার জন্যে
নুয়ে পড়েছে তোমার ভারি কাঁধ ক্রশের ভারে
ব্যঙ্গের মালা পড়ে পথের ধুলো মেখে গায়ে
মশানে এলে
আমরা উল্লাসে ফেটে পড়লাম, ঠোঁটের নোনা রক্ত
জিব দিয়ে নিলাম চেটে

বুকের মধ্যে আগ্নেয় গিরির জ্বালামুখ
পায়ের নিচে বধ্যভূমির বাসি রক্তে ছোপানো মাটি
আমাদের রোমশ থাবায় প্রতিহিংসার অন্ধকার
তোমার মুখ বিকৃত হয়েছিল যন্ত্রণায়
স্পন্দনহীন পাথর থেকে স্বেদবিন্দু উত্থিত হতে দেখেছি

ককিয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল কালভেরির চূড়া
বৃক্ষগুলি নতজানু. ডালপালা
ঝড়কে করছিল আহ্বান
রক্তবমন করছিল অন্তিম সূর্য পাহাড় চূড়ায়
আমরা পায়ের ক্ষুর ঠুকে ঠুকে গান গাইছিলাম
তৃপ্তির গান।

চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে কল্পান্তের বৃষ্টি নামলো না
কালভেরির শিখরে দেখা গেল না আগ্নেয়-গিরির **জ্বালামুখ**
শুধু ক্রোধান্ধ সূর্য বিদায় নিল
পৃথিবীর শবদেহ কালোচাদরে মুড়ে দিয়ে
আমরা রোমশ থাবায় ধরে থাকা সূর্যপাত্র থেকে
পান করছিলাম তৃপ্তির মদ

৩

চিরহরিৎ বৃক্ষের ছায়ায় শাল গায়ে জড়িয়ে
পাশমুক্ত যে হরিণ
বহু প্রান্তর মরুভূমি সমুদ্র অতিক্রম করে চলেছে
কস্মিনকালেও সে কি পৌছবে
বোবিক্রমের ছায়াতলে ?

আমার বুকের সমুদ্রে হিংস্র অন্ধকার ফণা তোলে
লোভার্ত চোখের মণি বিষাক্ত তীর।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'আগুনের বাসিন্দা' পূজোর আগেই প্রকাশিত হচ্ছে। দাম: চার টাকা। সিগনেট বুক শপ-এ খোঁজ করুন। প্রকাশক: কবিপত্র প্রকাশ ভবন।

কু-ক্লুক্স

ল্যাংষ্টন হিউজ / অনুবাদ : গণেশ বসু

ওরা নিয়ে গেল সেদিন আমায়
নির্জন এক গোপন স্থানে
বলল হ্যাঁরে, জানিস কি তুই
মহান শ্বেত জাতির মানে ?

তবে বললাম, হুজুর আমায়
যদি সত্যিই দেন আশ্বাস
বলব সব, মানতে রাজি
কেবল খুলুন হিংস্র ফাঁস।

শ্বেত লোকটি, বলল তখন
হ্যাঁরে ছোকরা, সত্যি বল
অমন ভাবে দাঁড়িয়ে কেন
কোতল করবে এই কি ছল ?

ওদের ভাণ্ডা মাথায় পড়ল
এবং ফেলল হিঁচড়ে টেনে
বেদম কষে মারল লাথি
ওই মাটি কি এ জান চেনে ?

দলের শরিক বলল, নিগার
এবার তাকা মুখের পানে
বলল, তুই জানিস ছোকরা
মহান শ্বেত জাতির মানে ?

পরবাসী পরবাসী পরবাসী

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন সময় নয়, সময় আসে না, আসবে না।
বাক্সভরা সমুদ্রের ছবি।
জ্যোৎস্না।
স্রোতের শব্দ নিয়ে
সারারাত
আগুনের শিখা
গন্ধের কুসুম
হৃদয়ের মত উপকূল
স্রোতের শব্দ নিয়ে
আমি সারারাত বসে থাকতে পারি।

সমস্তই স্থির হয়,
হাওয়া
হাত
অন্বেষণ
পদধ্বনি
তখন হয় তো থামে, জানি না, হয়তো বা থামে।
কাচের টুকরোয় ভরে
সমস্ত আলমারী।
তখন হয়তো স্থির অনিদ্রার দীর্ঘতর ছায়া।
তখন হয়তো আসে, আসতে পারে
নদীর মোহনা থেকে হাতে নিয়ে
অজস্র ঝিনুক।

জানো কেউ, বিষন্নতা কারা বয়ে আনে।
সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে
রহস্য রহস্য

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে একা একা
দরজা বন্ধ ঘর।
জানিনা, আকাশ ছুঁলে কি কারো শরীর চমকায়।
নিদ্রায় কি বিদায়ের শয্যা পাতা থাকে।

এখন সময় নয়,
সময় আসে না, আসবে না।

দেয়ালের ছবি দেখে কারা যেন বোঝায় আপ্রাণ,
পরবাসী পরবাসী পরবাসী

তবে যে মাটির দিকে এগিয়ে আসে
কুয়াশায় জড়ানো মাস্তুল।
সারি সারি অশথকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে
আবার পৃথিবী দেখে পাখি। বুক-জোড়া মুখে আলো ছায়া
উত্তেজিত মালা.....
ভিজে চোখ.....
সিঁড়ি বেয়ে সেইদিকে নেমে আসে উজ্জ্বলতা।

তবুও সময় নয়, সময় আসেনা, আসবেনা

বিদ্যুৎ চমকালেও কোন মুখ নেই।
বৃষ্টি হলে কেউ ভিজে যায়নাকো।
আশ্রয় আশ্রয়।
শয্যায় নৈঃশব্দ্য
আস্তে আস্তে অমোঘ ফাটল
অথবা চারদিক জুড়ে ডুবো পাহাড়ের মাথা,
কে, কে আসবে এখন?
অস্থিরতার মত
কাঁকড়াগুলো উপকূলে চলাফেরা করে।

কে, কে বলছ, ঘরে ফিরে যাও?
তবে দূর থেকে আজ স্রোতে গন্ধ নেমে এসেছে কি
নৈঃশব্দ্যের দুই ঠোঁটে ধরা দিয়ে গেছে কি এখন?
মুঠোভরা মসলিতে শরীর জড়ানো,
বেনীতে আরেক অন্ধকার।
কেন বলছ, ঘরে ফিরে যাও?

বিদ্যুৎ চমকালে আমি চেয়ে দেখি,
চোখ ফেটে যায়, তবু চেয়ে দেখি—
আলো ছাড়া অন্য মুখ দেখতে পাই না।
মাঝরাতে ঘণ্টা বাজলে
গীর্জার চূড়োয় রাখি চোখ—
অন্ধকার ছাড়া কিছু উড়ে তো যায় না।
সকালে স্নানের ঘাটে
শরীর ছাড়া তো কেউ স্নানেও আসে না।
তবে কি আসে না কেউ,
কোনদিন
কোনমুহূর্তেও।
অথচ সবাই বলে, আসবেই,
সবাই বলে, আসতে হবেই।

দিন ও রাতের মত জানি
এখন সময় নয়,
কখনো সময় ছিলনাকো,
সময় আসেনা,
সময় আসবে না,
আসেনা, আসেনা সময়।

দেয়ালের ছবি দেখে
কারা যেন বোঝায় আপ্রাণ—
পরবাসী পরবাসী পরবাসী

ঘাতক / জুডিথ রাইট

অনুবাদ : সামসুল হক

আগুনের মতো ঝকঝকে ছিল দিন,
পাখির কণ্ঠ যেন ভঙ্গুর কাঁচ,
তৃষাতুর হয়ে এলুম নদীর বাঁকে—
তীরে মৃদু ঘাস—শরীর ছড়িয়ে দি।

বুকের তলায় উজ্জ্বল শৈবাল
এবং আগাছা বৃষ্টিতে চিত্রিত,
ওষ্ঠ যখন সজীব জলকে ছোঁয় ছোঁয়
তাকে দেখলুম নল-খাগড়ার ঝোপে।

আঁধার থেকেই নিকষ কৃষ্ণ ত্রাস
লাফিয়ে উঠলো—প্রবল আবির্ভাব,
তার সেই তৃণপরিধান ভেদ ক'রে
আমি করি পৃথিবীর থাবা অনুভব।

দারুণ প্রহারে মাটিতে নুইয়ে দাও
আঘাত করো হে—যতোক্ষণ না মৃত্যু,
নতুবা তোমার নিজেরি জীবন যাবে
ঐ রক্তহীন চোখের নর্দমায়।

বারবার তাকে আঘাতে অবশ করি।
দুর্বল হ'য়ে থরথর ক'রে কেঁপে
লুটিয়ে পড়ে সে, হিমেল চাহনি তার
ঠিক্‌রে গড়ায়, দেখলুম নিহত সে।

কিন্তু হায়রে, আমার শত্রু ঠিক।
বাতাস অথবা জলের মতোই ক্ষিপ্র।
মৃত্যুর থেকে গোপনে ছিট্‌কে এসে
আমার গহন বোধিতে মিলিয়ে যায়।

চোখের সামনে এসেই উধাও হ'লো
আমার কুশলী সুচতুর শত্রুটি ;
পিঁপড়েরা সব ঘনায় সাপের কাছে
মদ খায় তার অগভীর চক্ষুতে।

দেওয়ালে ছায়ার দিকে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

দেওয়ালে ছায়ার দিকে চোখ রেখে
যদি ঘুরে ছাখো
চোখের নক্ষত্রে যদি যোজন যোজন ব্যাপী প্রসারিত আলো
ফেলে ছাখো
অনেক রাত্রির রঙ
অনেক রক্তিম নদী
মোহনার নিবিড় আকাশ
দূরাগত প্রতিধ্বনি—ব্যর্থতার তীব্র ইতিহাস।
আসলে কিছুই নেই
প্রেম—মৃত্যু—অশ্রু-হাসি আলোকের বিষণ্ণ প্রচ্ছায়া
রক্তিম করবী ডালে নশ্বরতা ফুল হয়ে দোলে
বোধিদ্রুম ঢেকে যায়
গাঢ়তর জটিল আঁধারে।

শুধুই শূন্যতা—নীল—অতলান্ত শূন্যের বিস্তারে
লম্বমান মেঘ—রোদ—হাওয়ার প্রবাহে
আসলে কিছুই নেই ;
শুধু এক ছায়া থেকে আরও এক ছায়ার আড়ালে
চলে যাচ্ছে এই সব যুবক-যুবতী—বৃদ্ধ—শিশু—নরনারী
দেওয়ালে ছায়াটা শুধু
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

ঘরবাড়ি ইমারত

নিখিলকুমার নন্দী

এই ছাখো মাঠে মাঠে বিকেলের সূর্যরং ইট প'ড়ে আছে
চিত্রার্পিত চুন লোহা সিমেন্টের অনুষঙ্গরূপে
অনেক বাড়ির সাধ জেগেছে যে তার মধ্যে আমি বেছে বেছে
এই এক সবদিক খোলা জায়গা রেখেছি বিরল স্তপে স্তপে
সাজাবো অনেক স্বপ্ন আবাল্য দেখেছি সব গিয়েছে সভয়ে
এই এক মধ্যজীবনের শেষ আশা দেখি যদি কথা রাখে
যদি পড়ে কোনক্রমে দুহাতের আতুলের দুই ফোঁটা বেয়ে
মহাত্মা ঈশ্বর তিনি সকরুণ, অকৃপণ, কৃপা তাঁর ধরি এক ফাঁকে '
আমরা তো দুটি প্রাণী দুই পুত্রকন্যা আর আমরা দুজনে
এ-অব্দি যা জমিয়েছি মাঝে মাঝে শ-পাঁচেক মাত্র উপার্জনে
ফুল কিনে না কিনে ও বই প'ড়ে না প'ড়ে ও এমনকি খেয়ে ও
না খেয়ে
এম্নি স্বপ্নের সুতো ভাড়াকরা ছাদে ছিল ঘরবাড়ি ইমারতে লাল
ঘুড়ি ছেয়ে
ছাড়া ছিল এতকাল, এবার গুটাবো ধীরে সুস্থে বস্ত, জেনো যার
বাঁচে
এম্নি যেন বাঁচে এই কলকাতায় কলকাতার কাছে।
সত্যিই সক্ষম তুমি সাফল্য নিরিখে কিন্তু আমি
কৈশোরের কলকাতায় সকালের ভিস্তিদের কলতানে নরম জলের
ঘুম চোখে শব্দ শুনে শব্দ শুনে রাত্রির তন্দ্রায়
রিক্সার ঠুনঠুন আর ট্রামের ঝিমন্ত ঝিকঝক
বড়ো হয়ে বড়ো হয়ে দেখলাম ছোটো হয়ে গেছি
আকাশ ধোঁয়ায় নিচু বাতাস ধূলোয় ভারী ভীরু
রোদের করুণা নেই স্বয়ং সে করুণাভিক্ষুক
বিজুরিত গবাক্ষের রোগে শোকে মূর্চ্ছা বুভুক্ষায়
শিয়ালদায় যেতে-যেতে কলকাতাকে একদা-প্রোজ্জ্বল

তরুণ বাড়ির পটে জীর্ণ পীত তরুর মতন
উৎকীর্ণ দেখেছি জরা, জন্তু যেন, অগণ্য জনগণ
হিংস্র, তাকে কিলে চড়ে হাতে পায়ে কনুই ধাক্কায়
মৃত্যুর দুয়ারে আহা নিমতলায় পৌঁছে দেয় বিকেল বেলায়
শ্মশানযাত্রীর ম্লান তারপর মুমুক্ষু আবেশে
চা খায় উদাস চোখে, চিন্তিত ও চিন্তাহীন বেকার, অথচ নির্বিকার।
তদবধি আর আমি কলকাতায় কলকাতার কাছে বা কোথাও
কোনো জায়গা বাঁচবার বেঁচে থাকবার মতো পাইনি, খুঁজিনি
কলকাতা কলকাতা আজ পুরানো পাঁজির মতো সের দরে
বিকোচ্ছে বাজারে।
: এতো হোলো দর্শনপ্রস্থান যেন আপনার আস্ত পরাভব
রেখে ঢেকে তুলে ধরো জয়ী যে সে তার অগৌরব।
কয়েকটি যে শুভ্র ফুল, স্নিগ্ধগন্ধী, এখনো ঝিমায়
তারা যাবে মারা যাবে চেপ্টে যাবে কংক্রীটে লোহাতে
কিন্তু কী উপায় বলো, দুঃখ পাই দুঃখজয় যাতে।
সুন্দর বলেছ সত্যি, কিন্তু ফুল। সে তো অতি সামান্য সজীব
তারও চেয়ে ঢের বড়ো কত সুখ কত জ্যান্ত প্রাণবন্ত শিশুর ইচ্ছায়
কৈশোর কল্পনারাজ্যে যৌবনের অভিষেকে কত ক্রুর দূর বনবাস
দাহ দিয়ে, দিতে দিতে, এ সাম্রাজ্য ইমারতে প্রৌঢ়ির সফলে।
সুতরাং শিশু গেছে, যৌবনের রক্তরাগ, ফুল গেছে, ফুলগাছও যাবে,
ঘরবাড়ি ইমারত তবু হচ্ছে, হবে—হবে—তুমি হবে, আমি কিন্তু
হয়েও হবো না—
পরাভূত? হতে পারি, তবু জেনো অভিভূত মুহ্যমান নই;
দেখে যাবো রেখে যাবো চুরুটের এ-চক্রে নয়, তর্কে নয়, দিগন্তেই
সূর্যাস্ত মথিত।

পতন! পতন!

তুলসী মুখোপাধ্যায়

পতিত অঞ্চল থেকে হা-রে-রে হাওয়া ছুটে এল।

ধুধু রেখা খাখা ভিটে রুক্ষমাঠ পোড়েশিবালয়
খরদিন খরামাস উইঢিপি ভস্ম—শবাধার
চারিপাশে নদীনারী বনবীথি যায় ঝরে যায়
আঁধিঝড় ধুলো ওড়ে বালু ওড়ে সূর্য ঢলে পড়ে
অদূরে বিশাল ধবল—কুয়াশায় কারা যেন কফিনবাহক
মাঝখানে মাইল মাইল শিলীভূত বারোয়ারীতলা
পতন ক্রমশ পতন—পৌণঃপুনিক পতন
অতঃপর হিমঘাসে মরাচাঁদ ঝরাপাতা তীব্র কশাঘাত
চারিপাশে নদীনারী দেবদারু যায় ঝরে যায়
পতিত অঞ্চল থেকে হুহু করে হাওয়া ছুটে এল।

ডালিমের ডাল তুমি পুঁতেছিলে—ডালিমকুমার
প্রজাপতি জুটেছিল ঘড়ির ডায়ালে
দেয়াল বানিস করে অশ্বমেধ দেগেছিলে ঘরের দেয়ালে
যেন ইয়াবড় সূত্রধর তুমি! যেন কোনো রাজার জ্যোতিষী
কিরণময়ীকে ডেকে সিন্দুকের ঝাঁপি তুমি খুলে দিয়েছিলে
পাতাবাহারের মতো চিত্রশালা পুষেছিল বুকের ভেতরে
বুঝি পুরো তেতে গিয়েছিল—পুরো খেপে গিয়েছিলে
ভেবেছিলে, ডালিম দানার থেকে মধুভাণ্ড তুলে এনে
অভিভূত ওষ্ঠ রাঙাবে—দুই হাতে আতর ছড়াবে
ভেবেছিলে, চিত্রল হরিণী এসে ঝর্ণার পাশে শুয়ে রবে
যেখানে চাঁদের শরীরময় পরীদের নাচ খেলা করে
ডালিমের ডাল তুমি পুঁতেছিলে—ডালিমকুমার
প্রজাপতি জুতেছিলো ঘড়ির ডায়ালে
হাতীর পাঁচ পা তুমি দেখেছিলে—যাদু

বুঝি পুরো মাত হয়েছিল—পুরো চুর হয়েছিলে
পতন ক্রমশ পতন—প্রপাতের মতো পৌনঃপুনিক পতন।
চারিপাশে নদীনারী ঝাউবীথি যায় ঝরে যায়।

ত্রিশবছর তুমি মল্লক্রীড়া করে গেলে গোলকধাঁধায়
ত্রিশবছর শুধু কেতন ওড়ালে তুমি তাসের থামারে
ত্রিশবছর তুমি জীবন যৌতুক রেখে আলেয়ার ঘর করে গেলে
ভেবেছিলে। অশ্বমেধে বিশ্বজয়ী দৌড়বীর তুমি
অভিভূত শরীর রাঙাবে—দুইহাতে আতর ছড়াবে
যেন তুমি কতো বড় আলালের আদুরে দুলাল
কী এমন পুলক তুমি দেখেছিলে বাসুকী ফনায়
বুদ্‌বুদের মতন তুমি চিত্রশালা পুষেছিলে বুকের ভেতরে
ত্রিশবছর ধরে ফানুস ওড়ালে—এলেবেলে ফানুস ওড়ালে
চারিপাশে কুয়াশাবাহিনী মরাচাঁদ হিমঘাস কুয়াশাবাহিনী
পতিত অঞ্চল থেকে শোঁ শোঁ করে হাওয়া লাট খেল।

আমি ঘুন ধরে গেছি—একেবারে ক্ষয় হয়ে গেছি
জীবন যেতেছে চলে—নাথ হে
জীবন গিয়েছে চলে—এ জীবন তামাদি হয়ে গেছে
আমি ঘুণ ধরে গেছি—আমি ক্ষয় হয়ে গেছি
বুঝে গেছি, সহায়হীনতা ছাড়া
আর কী সহায় আছে আমাদের হাতে
অন্ধকার হওয়া ছাড়া এই অন্ধকারে কোনো ভবিতব্য নেই
একটা পতন থেকে ছাড়া পেয়ে আরো এক পাতাল পতনে
ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের ছুটে যেতে হয়—পতন! পতন!
তবুও অভ্যাসবশে জীবনের ধুনি জেলে পরমায়ু জাগ দিতে হয়
অভ্যাসবশত হায় অভ্যাসের দাসখতে শিরদাঁড়া সঁপে দিতে হয়
পতনের পতন তুমি চেয়েছিলে! কী এমন পতিত পাবন!
আলাদীনের দীপ পেয়েছিলে নাকি!—
অতএব অভ্যাসবশত বুঝি—

প্রজাপতি জুতে দিয়ে ঘড়ির ডায়ালে
কিরণময়ীকে নিয়ে সংসার পেতেছি—
সে কি দিবাস্বপ্ন নাকি? নাকি শুধু ঘোরের বিলাপ
তবু হয়—মাঝে মাঝে তবু কেন চারিপাশ দপ্ করে ওঠে
দেখি, চিত্রল হরিণী এসে ঝর্ণার পাশে শুয়ে আছে
শুনি, চাঁদের শরীরময় পরীর নাচের মতো রুনুঝুনু ধ্বনি।
সে কি দিবাস্বপ্ন বুঝি? নাকি শুধু ঘোরের প্রলাপ!

দূরে কিংবা নাতিদূরে তবুও কী শব্দ বেজে চলে।
জীবন গিয়েছে চলে নাথ হে—জীবন যেতেছে চলে
হলুদ রোদের মত এ জীবন তামাদি হয়ে গেছে
উদোমবাতাসে ডাকে প্যাঁচা, নাচে হিম, ওড়ে মরাচাঁদ।

পতিত অঞ্চল থেকে হা-রে-রে হাওয়া ছুটে এল।

অপাপ দুঃখের স্রোতে চক্ষু যায়

রণজিৎ দেব

চোখের পল্লব থেকে সব আয়ু ঝরে পড়ে
অপাপ দুঃখের স্রোতে গাল ভাসে চোখের লজ্জায়
অলক্ষ্য স্বপ্নের চেয়েও অদ্ভুত ওঠে এসে
কি মায়ায় জড়ালে তুমি চোখের মরণে।
একটি গোলাপ-কুঁড়ি হাতে তুলে জোর ফুৎকার
উড়িয়ে দিতে.....
চক্ষু যায় চক্ষু যায়
চোখের পল্লব থেকে সব আয়ু ঝরে পরে চোখের লজ্জায়

প্রতিবেশী বাড়ীগুলো পুড়ে পুড়ে ধোঁয়া হয়, ছাই ওড়ে,
কি বিষম উল্কাপাত

অনিদ্র রজনীতে কার ছায়া তবুও কাপে, তবু কার হাতখানি
বুক ছুঁলে ভয়ের কম্পন ?
ক্ষীণমনসা বুকে চেপে কে তুমি ওঠে এসে
মুখোমুখি কথাবলে অনিঃশেষ চোখের মায়ায় ?
কেমনে জানাই বলো : চক্ষু যায় চক্ষু যায়।

সত্য

গৌতম মুখোপাধ্যায়

বয়স আমার অশীতিপর, কঠিন কশা শিশুর মুখে হাসি,
আলজিহ্বায় বাজান ক্ষমা, জানতে পেরে বুকের মহাপ্রাণী।
দৌড়ে গেছি ডিঙিয়ে ট্রাফিক, পেরিয়ে শহর মুক্ত গাড়ীর মতো,
চড়ক ডাঙায় ঘুরতে হোলো, ফিরতে হোলো আবার ইতস্তত:।

তখন চাবুক, কঠিন চাবুক, দৌড় লাগানো পাপী
গাড়ীর মৃত্যু, নতুন ভুবন দশদিকেতেই দাগি।

আবার কখন যমের মশাল দেখায় পাতাল
খুব কাছে খুব দামাল বার্তাবহ,
শিড়দাঁড়াটি সটান সোজা, পাঁচ অঙুলে পাঁচটি ছুরি,
হঠাৎ ভুবন, নতুন ভুবন ! বৃদ্ধ পিতামহ
আমার বৃদ্ধ তাত
জবা ফুলের মতন শিশু, নতুন শিশু, সদ্য সূর্যস্নাত।

বুকের সেবাদাসী
অক্ষমালা এদিক করেন, ওদিক করেন
বলেন—'আছি, বুকের কাছাকাছি',
সমস্ত সব ভুল,
বুকের মধ্যে নতুন ভুবন, রামকৃষ্ণের আঙুল॥

শরবিদ্ধ

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

দু'হাতে কুড়িয়ে নাও—অদূরে রৌদ্রে সোনা ঝিল্‌মিল্
সুপ্ত বাসনাগুলো দীর্ঘ হাতছানি দিয়ে ডাকে
পাওয়ার অতীত থাকে যে কোন বাসনা
সুখকে বেঁধনা ঘরে—পাখি,
আমি ছেড়ে ছেড়ে রাখি ;

যেহেতু পরিণতি সকলে জেনেছি বেশ শুভ্রতা শিখর হ'য়ে থাকে
এই সব পাণ্ডুলিপি চিত্রলিপি কালের সায়রে
লুপ্তপ্রায় চিঠিগুলো কোনদিন যুক্তিনিষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক
দুর্বোধ্য লেখাগুলো রেখাগুলো পড়ে পড়ে খুঁজে যাব আমার
অতীত ;

দু'চোখে জলধারা গড়ানো পর্যন্ত আমি ঠিকানা খুঁজব
অনামিকার আংটিখানা কোথায় যে হারাল এই
অন্ধকারে বিদ্ধ হ'চ্ছি—"আলো, আলো—বড় জ্বালা—আলো"
প্রসূতি-আক্রোশে সেই অন্ধকার চূর্ণ হ'য়ে যাক্

জটায়ুর প্রতীক্ষাতে পেতে চাই রামের সাক্ষাৎ।

শব্দময় দৃশ্যপটে

অমিত গুপ্ত

শব্দময় দৃশ্যপটে
অস্বচ্ছ দর্পণে
এই বিশ শতকের আমি এবং আমার ঐহিক
প্রতিবিম্ব
ক্রমাগত ক্ষয়িষ্ণু : পীড়িত-প্রায়।

মহেন্‌জোদাড়ো অথবা হরপ্পার মতো
ইহ্‌ মানবিক সত্তাকে
ইতিহাস স্মৃতির দর্পণে
সমর্পণ করে,
মৃত যাদুঘরের সৌখিন দৃশ্যে নয়,
শতাব্দীর চেতনায়—
অনুভূতির ভাস্কর্যে অপর্ণা করি।

রোগ শয্যায়

স্বপনকুমার গুপ্ত

না, না, থাক, পার্লারটা খোলা থাক—শব্দ তুলে ওটাকে বন্ধ কোরনা,
তোমাদের চিন্তা—জ্বরটা বাড়ছে, মাথা ধরা, দেহ ব্যথা ;
বরং ততক্ষণ আমায় শুনতে দাও—কাঁচের পাত্রে ছড় টানা শব্দটা যন্ত্রণা
কাতর,

আমার যে বড় কষ্ট—তোমরা বুঝবে না
আমায় একটু একা একা থাকতে দাও।

এবং আলোটা উসকে দিওনা—প্রচ্ছায়া দীর্ঘ হয় হোক
ক্যামেরার কান হবে—ফটো পাওয়া যাবে
হয়তো অবাক হবে—আমি মারা গেছি—
অন্ততঃ ফটোতে কোনো হৃদয় মেলেনি।

মুগ্ধ একাঘরে ভয়

আশিস সেনগুপ্ত

তবু এই বেকারী বড় ভাল
চোখ খুলে অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যায়
কারা যেন আসে ফিসফিস মেরুণের রঙ
স্কন্ধকাটা কবন্ধের দল রাশি রাশি ভরপেট
বেলুনের ভ্রূণ—

কারা যেন আসে, চড়ক ডাঙার গাড়িতে চড়ে
কারা যেন আসে চলে যায় সলিমের সাথে
লাট খাওয়া রকেটের মত লক্ষ্যহীন
বোঝে না কোথায় যাবে তারকারা আছে কত দূর।

তবু এই বেকারী বড় ভাল
বধ্যভূমির অস্পষ্ট কিনার থেকে শিল্পীরা
তুলিরঙ কালি ঝুলি নিয়ে অদৃশ্যে অধীর
আমি অশ্বক্ষুর দারুন চিৎকারে
গভীর ভয়ার্ত দুপুরে ফিরে আসি
বিবস্ত্র উদ্বাহু সঙিনের ডাক
খড়গ তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়নি এখন
দেওয়ালের গা কেঁপে মেঝের বিস্তারে মিশে যায়
এই বেকারী বেলায়
মুগ্ধ একা ঘরে ভয়…

দুপুর গড়িয়ে ক্রমশঃ বিকেল ক্রমশঃ গভীর রাত

অনিল আচার্য

দুপুর গড়িয়ে ক্রমশঃ বিকেল ক্রমশঃ গভীর রাত
চৈত্রের হুতাশ হাওয়া, ব্যাঙ ডাকে, দূরাগত ধ্বনি ভাসে
চার্চের শীর্ষটিতে অজানা ঘড়িতে সংকেতের পুতুলেরা ভীড় করে
হি হি হি হি হেসে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ক্রমে অদৃশ্যে বিলীন।

উপজীব্য সঙ্গিনীর ঠোঁট, বুক, চোখ, মদির দৃষ্টির ঝিলিক
রাত হয়, বিনম্র মুহূর্ত কাঁদে ; এমনি করেই
জেগে কি থাকা যায়……জেগেই কি থাকা ভালো ?
সাহানার সুরে বাজে রাতের বেহালা, কাঁপে নাগফণি,
করুণ মুহূর্তগুলো প্রকাণ্ড সৃষ্টির মতো বুকে চাপে, শ্বাসরুদ্ধ হয়।

দুপুর গড়িয়ে ক্রমশঃ বিকেল, ক্রমশঃ গভীর রাত
বুক চেপে বৃদ্ধশিশুরা বুঝি সুপ্তিতে স্থির, ক্রমশঃ সকাল হবে,
এবং বিকেল, সকালে ঘুরে ক্ষুধার উদ্রেক হয়...আর
বিকৃত-স্মৃতিরা সব তারাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়।
দূর প্রবাসিনী নারী স্মৃতিচিহ্ন দিয়েছিল উপহার—নিঝুম দুপুরে
অথচ এখন ছাখো ক্রমশঃ বিকেল···ক্রমশ; গভীর রাত
সমস্ত নিঃসঙ্গ মন কেঁদে থাকে, কেঁদে কেঁপে ওঠে অস্তিত্ব ভিক্ষায়,

একবার প্রগাঢ় সুপ্তিতে এসো মেতে যাই
বিকৃত স্মৃতিরা দূরে বিক্ষোভ জানাক...তারারা কাঁদুক।

এখন জেগে শুধুই কবিতা হয়—দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে অবিস্মরণীয়
অথবা চৈত্রের বাতাসে হু-হু তান শোনা যায় বেশ কিছুক্ষণ
চোখের কালো বলয় ঘিরে মদির নেশা তিরতিরিয়ে কাঁপে
বিগত অনেক রাত প্রাণ পায় নিশ্চুপ বিদ্রোহে—

দুপুর গড়িয়ে ক্রমশঃ বিকেল ক্রমশঃ গভীর রাত
এখন কি জাগা যায় এখন কি জাগা ভালো
সুদূর স্মৃতিরা আর বসে কেন, গৃহস্বামী ভীষণ বিব্রত
ভদ্রতায় পাততাড়ি উচিত গোটানো,
কেননা এখন, দুপুর গড়িয়ে ক্রমশঃ গভীর রাত বিকেল পেরিয়ে

এই কলকাতা

সন্তোষকুমার অধিকারী

বিকেলের আলো নিভ্‌লে মাঝে মাঝে এই কলকাতা
মনে হয় আফ্রিকার কোন এক অরণ্য-সীমানা।
নখদন্তে আরণ্যক, সহস্র শ্বাপদ অধ্যুষিত ;
চেতনা বিদ্বেষে ক্ষিপ্ত, যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত হায়েনা।
লোভার্তি হৃদয় জুড়ে ভীড় করে যূথবদ্ধ হ'য়ে,
চারিদিক দিয়ে বয় শুধু এক প্যাষ্টারের নদী।

কলকাতা সাহারা নয় তবু চোখে নাচে ওয়েসিস—
যশ, অর্থ, রাজনীতি। আকাঙ্ক্ষারা শব্দময় হ'য়ে
পক্ষ মেলে দেয় মেঘে ; নির্বোধের হাততালি কানে
যেন যুদ্ধ দামামার ধ্বনি। আগ্নলগ্ন দুইচোখ
স্বার্থের আঁধার মগ্ন—উটপাখি বালুতে যেমন।
ইচ্ছাগুলো মাঝে মাঝে বারুদের অগ্নি হ'য়ে ফাটে।

আফ্রিকার অন্ধকার তারপর দেখি পার্কষ্ট্রিটে,
পাশাপাশি রাতজাগে অগণিত কামনার্ত দেহ।
শাণিত বর্শার ক্ষুধা বিদ্ধ করে আতপ্ত শরীর।
জনতার অন্ধকারে ডাক দেয় চিত্রল হরিণী ;
প্যাষ্টারের চোখ জাগে জুগুপ্সায়, লোভে। অশরীরী
ছায়ার মিছিলে পথ মিশরের মরু মনে হয়।

একদিক : অন্যদিক

তারক দত্ত

ত্রিকালজ্ঞ দর্শনের স্বচ্ছ আয়নার কোলে, দীর্ঘতর
দিগন্তের রঙ মাখা সূর্য স্পর্শ, অহংকারে
উত্তপ্ত করে না ধূলো মাটি ছোয়া এমন, চঞ্চলও
অতল স্মৃতির প্রসারিত উষ্ণ বুকে
উৎসাহের গাঢ় রশ্মি ঢেলে ;
চিন্তার কী যন্ত্রণায় একই স্বপ্ন ভিজে
মন, সযান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে
সে কোথায় ছুটে গেল নির্বাসনে, ইতিহাস ছিঁড়ে ;
অসংস্কারে সখের বাগান
আগাছার অরণ্য দুর্গম
একাকার বনজ প্রশ্রয়ে !

যাত্রীর হিমেল অনুভূতির তুহিনে
সব বন মুছে গিয়ে ধূসর পৃথিবী,
আত্মমগ্ন অবিজ্ঞানী উৎসবে এখন
চলিষ্ণু স্রোতের নিবিকার অন্ধকারে ;
অথচ আয়নার বুকে প্রতিচ্ছায়া, সোনালী উজ্জ্বল
মোহনীয় প্রবর ভঙ্গিতে ;
আহা ! মুগ্ধ পৃথিবীকে দেখেছি দু'চোখ
চরিত্রের রাঙাছবি ঘেটে !
তবু এ আয়নার উল্টো পিঠে অন্ধকার
সময়ের নখচিহ্নে আরণ্যক পদশব্দ ছুঁড়ে ;
অথচ উত্তর পথে এখনও আমি যে মধ্যদিনে
কালের নূপুর বেঁধে ছুটে চলি শোণিতের টানে।

নির্বাসনে

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

নির্বাসনে, রাজ্যপাট কোথায় কে জানে !
দীপ নিবে গেলে অন্ধকার পথে
রক্তাক্ত তোকে তুলে নিই,
ভাঙা চাঁদে প্রচ্ছায়া পড়ে
জলের উপরে
হেমন্তের রাতে
বর্ষার শব্দের মত
তবু মাঠের ধারে অলস নত
হয়ে বসে থাকি
বুকের রক্তপদ্ম ছিন্ন হলো,
নিভৃতে আমাকে নিয়ে
কশাইয়ের মত কারা যেন
খুন ক'রে চলে গেল।

অপরা বিদ্যা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এখন আমার মাথায় তোমার হাত,
ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসা
চুলের নিচে যে মেধা ও মৃত্যুর মৌন মেলামেশা
তুমি ভালবাসার অভ্যাসে সেই দৈব ছুঁয়ে আছ, ক্রমে রাত
নক্ষত্রের যোগ্য হলে তুমি স্পর্শ নিয়ে
পুরুষত্বের প্রতিউপান্তে যাবে। ক্লান্ত
চারদেয়ালে বাতাসে কি করে স্বর্গরাজ্যের ভ্রান্ত
সাময়িক গড়তে হয় সভ্যতা সরিয়ে
তুমি তা ভালই জান।
আর কে না জানে বাঘিনীকে একবার
রক্তের সরব স্বাদ দিলে সে হাড় মাংসের ডুগডুগি না বাজিয়ে
ছাড়ে না, অথচ আমি সে বাজনায়ও ছন্দ চেয়েছিলাম ! তাইতো এই
ভর কলির সন্ধ্যায় শব্দের উৎসব সম্ভাবনাহীন স্নায়ুকেন্দ্রকেই
ভীষণ নতুন করে সহজ সরল এক দোতারায় বাঁধতে চেয়েছি।
কেননা ভাষায় আজো বহু দুঃখ, ত্যাগ ; অথচ বিরহে
যে সব সশব্দ ইচ্ছা যৌবনের আত্মরতি ক্ষয়ে
বয়সের ঠিক ওপরেই স্বাস্থ শুয়ে আছে,
তোমার তৃষ্ণার অসম্ভব ঝাঁকুনিতে ঝাঁকুনিতে
বিরক্ত হয়েই তারা প্রতিঘাত দিতে
জেগে উঠতে পারে। আর তুমি যখন স্পর্শের জয়ে
মেধা ও মৃত্যুকে সরিয়ে ক্রমশ বুক, বুক থেকে
একে একে ইন্দ্রিয়ের সিঁড়ি বেয়ে ব্যক্তিত্বের মতো নিচে নামো
নামতে নামতে মাঝে মাঝে দুহাত এগিয়ে দাও কেন্দ্রের দৃঢ়তা
পরীক্ষায়
ভালবাসা···না না ভালবাসা নয়, কবির মনীষা সনাতন সতীন ঈর্ষা

চীৎকার করে ওঠে—"থামো।"
কিন্তু দেরী, অসম্ভব দেরী হয়ে যায়
আর যত মর্ত ভুলে ভরে ওঠে স্নায়ু,
শরীরের সঙ্গী পরমায়ু
এইভাবে আমাকে ফিরিয়ে আনে সিদ্ধিহীন অপরাবিদ্যায়।

পবিত্র বিধান

[Gabriela Mistral এর Holy law কবিতার অনুবাদ]

অনুবাদ : নচিকেতা ভরদ্বাজ

তারা বলে একটি প্রাণ প্রবাহিত হয়েছে
আমার দেহ থেকে
আর চোলাইয়ের যন্ত্রের থেকে উপচানো মদের মতন
উৎসারিত হয়ে উঠছে আমার শিরা উপশিরা
প্রাণের আগমনী সংবাদে।
কিন্তু নিবিড় একটি শান্তির অনুভবে এখন
পরিব্যাপ্ত আমার সত্তা—
একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচনের পর
নির্মুক্ত লঘুভার হৃদয়ের মত যেন!
নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি আমি—
"কে আমি?"—কী এমন পুণ্য করেছি যে
এমন একটি শিশু পেতে পারি
আমার বুকের মধ্যে—আমার কোলে?
এবং নিজেই উত্তর দিয়েছি আমি তার—
"একটি নারী—যে ভালোবেসেছিল
এবং যার ভালোবাসা,
দীর্ঘ বিলম্বিত তার চুম্বনের কলরোলে
অসীমের আকৃতিতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল অব্যক্তের দিকে।"
এই তো আমার ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেছি—

পৃথিবী দেখুক আমাকে—পাহারা দিক
আশীর্বাদ করুক সস্নেহে আমাকে,
কারণ এখন আমি ফলন্ত হয়ে উঠেছি
তালবৃক্ষের মতন
আর উজ্জ্বল উচ্ছল সবুজ ক্ষেতের আলের মতন
পূর্ণতার ঐক্যে অপরূপ

বুকে রইল না স্পষ্ট কিছুই

শুভঙ্কর ঘোষ

বুকে রইল না স্পষ্ট কিছুই ; শুধু ভিন্ন ব্যথায় আরক্ত মেঘের জটায়ু
ডানাভাঙ্গা পাখির চোখ উদভ্রান্ত।
ডানাভাঙা পাখির চোখ টলোমলো, ম্লান, ঝাপসা।
বুকে রইল না স্পষ্ট কিছুই ; ওই ঘোলাটে আকাশ হাসে না, শুধু
স্থির চৌকিদার
যেন দূরবর্তী দেবদারু গোধূলি সন্ধ্যার...
যৌবন কি ভুল স্বর্গ?

অনন্ত তৃষ্ণার ভেতর কেন জাগে না
কেন জাগে না আর স্মৃতিগাথা
কেন স্বপ্নেও জানে না রূপ-কথার আধার মাণিক গোটা
বাংলার চেনা-হাসি? কেন সত্তায় জাগে না
স্বপ্ন লোকের চাবি?
কেন পাইনে কেন পাবনা আমার সবুজ নবান্নের গ্রাম ; বুড়ো বট
কি মন্ত্র জানে, হারানো প্রেম ফিরিয়ে দেবার মন্ত্র!
স্বর্গ ফেরা গল্প কি আর কেউ শোনাবে না? যৌবন কি ভুল স্বর্গ?

স্বচ্ছ খোয়াই কোথায়? ঝর্ণাপাথর গড়িয়ে দিয়ে হাততালিতে মুখর
হবার

রক্তবর্ণ গোলাপ কোথায় ? কোথায় বলো পুরনো দিনের
শান্তিনিকেতন ?
শিশুর অমল ছোঁয়ার মতন চিকণ কোপাই উদাস কোপাই কোথায় ?
কোথায় আমার সবুজ নবান্নের গ্রাম ?

বুকে রইল না স্পষ্ট কিছুই ; শুধু ভিন্ন ব্যথায় আরক্ত মেঘের জটায়,
ডানাভাঙা পাখির চোখ উদভ্রান্ত
ডানাভাঙা পাখির চোখ টলোমলো
বুকে রইল না স্পষ্ট কিছুই : কোথায় আমার সবুজ নবান্নের গ্রাম ?
বুকে রইল না স্পষ্ট কিছুই, যৌবন কি ভুল স্বর্গ ?

বৃষ্টির স্বাদ

আশিস সাহাল

কেমন রমণী তুমি ? দু'চোখের নিমগ্ন প্রান্তরে
শ্রাবণ মেঘের মতো ধ্বনিময় বিচূর্ণ করুণা
ভ্রূ ভঙ্গে আঘাত হানো প্রত্যহ নির্ভয়ে। সন্ধ্যার নির্জনে
যেমন নীলিম বৃক্ষে নক্ষত্রের প্রচুর মহিমা

দ্বিধাহীন আন্দোলিত— তেমনি হে রূপবতী তোমার আশ্বাসে
অফুরান বৃষ্টি নামে চোখে স্থির চোখ রাখি যেই,
এ কোন জলের স্বাদ ? মনে হয়, পৃথিবীর কোথাও প্রাঙ্গণে
এমন ধ্বনিত বৃষ্টি যেন আর কোনোখানে নেই ॥

নিজস্ব

তপনলাল ধর

স্বর্গীয় রঙ
ওপর থেকে নীচে,
স্বর্গ, যেখানে ঈশ্বরের বাসভূমি (লোকশ্রুতি ১)
ধরাতলে, তার ইচ্ছার বর্ণিকাভঙ্গ

অগভীর কালো বা সবুজ
অস্বচ্ছ শরীরে আঁকা পদ্ম, পদ্মের চতুর্দশ দল
চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল
সারা বিকেল তাদের সংগ্রহ করতে করতে একসময় অন্ধকার
হয়ে এলে

ফিরতে চোখে যে ছবি আসে
একজন
নিয়ত মসৃণ ত্বকের চতুষ্পার্শ্বে গোলাপী রঙের চোখ
এঁকে রাখে

আমাদের জন্য নতুন পোষাক শুধু ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন
নতুন রঙ বা অভিধা
আমরা পুরোভাগে থেকে শুধু অনর্থক
মনোনিবেশ ক্ষুন্ন করে যাই

সবুজ রঙ দেখলে আমার লোভ হয়, তার পাশে
চতুর্দশ সিঁড়ি বেয়ে
নীচে এসে ঈশ্বর কোন দক্ষ কারিগরের হাতে
আমার অভিষেকের পোষাক পাঠাবেন
আমার শরীরে ভীষণ দাহ
রোমকূপে তরল অগ্ন্যুৎপাত

স্বর্গীয় রঙের দেয়ালে ঈশ্বর আমার
অন্তিম সময় লিখলেন (লোকশ্রুতি ২)

চেতনা নিবিড়

অতীন্দ্রিয় পাঠক

চেতনায় নীলাভ আকাশ গহণে অপার তৃষা
দিকসারি অর্জুনের বন কাশবনে দীর্ঘশ্বাস
ধ্বনিত বালির তীব্র ঝড়ে প্রতিধ্বনি লোকালয়ে
গৃহকোনে দেবতার ঘরে সঞ্চিত জীর্ণ আসবে।

এ আকাশে পাখীরাও মাঝে মাঝে ওড়ে
বর্ণালী বিচিত্র মেঘে ঊর্দ্ধগামী চোখ
মেলেছে উজ্জ্বল পাখা স্ফুরিত জ্যোতিতে
আনন্দবিহ্বল দিন শুভ্র পারমিতা
চেতনায় শিহরণ আকাশটা কাঁপে···
শব্দ হয়ে ওঠে···শব্দ···ক্রমে শব্দময়···

এমন অনেক বার দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে
বিবাগী মনটা খেয়াল খুশীতে
আকাশের গায়ে যত মেঘ রক্তিম বর্ণালী ও ধূসর
ক্রমশঃ সরিয়ে দূরে অনাবৃত সূর্য গায়
গভীরে ও নীলে
চেতনা ক্রান্তি খুঁজতে গিয়ে
আবার সে মেঘ অনাবৃত সূর্য
আহত যন্ত্রণা
নিবিড়ে গোপনে পাহাড়ে প্রান্তরে সূর্যমেঘ আলোছায়া
আনত সুদূরে...

দ্বিতীয় অন্তর

বিজয়কুমার দত্ত

১.
আমার, একদিকে খাদ—আর একদিকে গভীর চোরাবালি
আমার, একদিকে ঝড় আর একদিকে মেঘের করতালি
আকাশ ভেঙে শব্দ হ'তে চায়—
আমার একদিকে বিষ
অন্যদিকে জ্বলছে অহর্নিশ
চিতার আগুন—অন্ধ বাসনায়!
আমি কোথায় রাখি পা।
আমার—ভিতর বাহির সমান জলে
ভস্ম পরিণতির তলে
আমার,—রক্তে ভাসে দারুণ দাহে মৃত্যু প্রতিভা।

২.
আমরণ জেনে যাবে এই কথা—
আমি, কাছাকাছি থাকার গৌরবে, যাযাবরী মোহে
ঘুরে ঘুরে ফিরে আসি, যেমন পাখীরা ওড়ে ঋতু প্রদক্ষিণে
অথবা যেমন কাঁপে জ্যোৎস্নাভরা আলো—
তেমন তোমার খুব ঘনিষ্ঠ নিঃশ্বাসে
দক্ষিণ বাতাস হয়ে ঝরে ঝরে করে
নীলিমা বিস্তারে, শূন্যে নীল হ'য়ে গেছি।

———

বস্তুর আলেখ্য

মানস রায়চৌধুরী

সব শূন্যতার মাঝে এত সব বস্তুর আলেখ্য
চাবির শিকল ওই ছড়ানো ছিটানো গ্রন্থি
ইস্পাত-নন্দিত গ্রন্থি আলো নিরালোক—
প্রতি মুহূর্তেই দেখি স্থান-পরিবর্তনের ছলে এদের ছায়ারা
আমাকে সম্পূর্ণ বাঁধে যেন বা শৃঙ্খল।
এরা মানুষের মানুষীর চেয়ে ঢের আন্তরিকতায় বেড়ে ওঠে
আমার যাওয়ার পথে বস্তুর সংরাগ এতো পুঞ্জাকার
আর কারো মুখচ্ছবি ধরেনা চোখের তারা
আর সব দূর ক্রম-দূর...
এমন আদিম পৃথ্বী আমার অস্তিত্ব,
ওগো রাখাল বালক তুমি গোধূলি বেলার আলো আমাকে
সামান্য দাও ধার

আমি ফিরে যাই এই ধাতব পৃথিবী ছেড়ে
মাটির ভিতর দিয়ে শস্যে ফলে শিশিরের ঘুমে
শৈশবের মাছরাঙা, হয়তো কোথাও বসে আছে
হয়তো কোথাও গঁমে লেগেছে হেমন্ত এক বিস্তৃত কুয়াশাময়
আরক্ত আঁচল

আমার চারপাশ থেকে ভিড় করে আসে ছায়া
ক্রুদ্ধ অটোমোবিলের ডিজেল হুংকার
মৃত্যু, বিদ্যুত বাঁধানো লাইনে পাম্প ও মোটর
ছিন্ন টারবাইনের ঘোরালো চক্রান্ত
ঘরের ভিতরে চাই
দেখি বস্তু ফ্লাওয়ার ভাসের বুকে স্থির জেগে থাকা
ছাইদানে পুরোন সময় আর জনহীনতার বীক্ষা বাইরে ভিতরে—

বস্তুই আমার সব প্রেম ও ঘৃণার অবশেষ
ভাঙা হাড়ে সুতীব্র বেদনা বাজে
মনে করি এইভাবে সঞ্চয় হয়েছে মর্মভেদী
মানুষের শূন্যতায় স্বপ্ন বারবার ডাকে নিহত ছায়ার কাছে
পাখীর কান্নার কাছে যেখানে স্তম্ভিত আছে
শত অরণ্যের শোকোচ্ছ্বার
যেন বাতি দীপাধারে আসবাবে গূঢ় ছায়া
আমাকে সমস্ত ঘেরে জায়মান ভবিষ্যের প্রত্নমহিমায়।

পাঞ্চালীর শেষ লজ্জা কৌরব সভায়

অরুণাভ দাশগুপ্ত

এভাবে সমস্ত যায়, দুর্বিনীত বয়সের কাছে
নিয়মিত সৌভাগ্যের পাশা হেরে হেরে
পরবাসে নির্বাসন, ভাগ্যস্থানে পাণ্ডবের অমোঘ নিয়তি

এভাবে সমস্ত যায়, দুর্বিনীত বয়সের কাছে
কি রকম নিঃস্ব হয়ে গেছি

সূচ্যগ্র মেদিনী নেই, যার জন্য শর্তযুদ্ধ প্রস্তুতি সাধনা
পরম উদ্ধার নেই, যার জন্য অর্জুনের লক্ষ্যে স্থির থাকা,
কোন অপার্থিব করুণাও বুঝি আর অবশিষ্ট নেই
যেটুকু আশ্বাস পেলে নির্দ্বিধায় ধরে রাখি শেষের সম্বল—
পাঞ্চালীর শেষ লজ্জা কৌরব সভায়।

ক্লীবের সংসারে এসে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমি একটি কিশোরীর হাত নয়, স্তন ছুঁয়ে বেড়িয়েছি
সারা সন্ধে ফুটবল মাঠে।

তাকে ডেকে নিয়ে গেছি প্রথম সুযোগে,
আগাছায় ভরা মাঠ, তিনদিন অবিরল জল ঝরছে, এধার-টায় কেউ
এ হেন দুর্যোগে বড় ঘেঁষে না। যে বালিকাটি 'মাস্টার মশায়'
কুণ্ঠিত গলায় ডেকে আঁক বুঝতে এসেছে ক'বার,
তাকে একা পথে পেয়ে
সম্ভ্রান্ত গম্ভীর স্বরে ডেকে নিয়ে গেছি ময়দানে,
দারুণ লজ্জায় কালো ভয়ে এতটুকু হয়ে যাওয়া
আমি একটি কিশোরীর হাত নয়, স্তন ছুঁয়ে বেড়িয়েছি
সারা সন্ধে মাঠের নির্জনে।

প্রাপ্য বুঝে নিতে চাই—আর কতকাল
নুনের পুতুল হয়ে নেমে যাওয়া সমুদ্রের জলে ;
করতলে শনি বক্র ? আমি তাকে বেদম পিটিয়ে টিট্ ক'রে যাবো,
ইচ্ছে হলে পদ্য লিখবো, ইচ্ছে হলে লিখবো না পঁচিশ বছর,
বন্দরে দাঁড়িয়ে শুধু ক্রেনে তোলা জাহাজের মাল
দেখবো, রমণী চাই না, স্রেফ বেল্লিকের মতো ক'টি কিশোরীর
পায়ের গোড়ালি দেখে ন'জন্ম কাটিয়ে দিয়ে যাবো—
অবশ্য এ প্রতিজ্ঞাও বাঁচে না খেলার মাঠে।

আমি বিবাহিত,
ঘরে কুসুমের মতো মেয়ে আছে, এখনো যুবতী-হেন-জায়া
পরিতোষে কোল দেয়। কলেজের ছুটি হ'লে কলকাতায় মায়ের
আদর,
লক্ষণ প্রতিম ভায়ের অঢেল শ্রদ্ধা, ছোটো বোন দুপুরে বিছানা
গড়িয়ে বালিশ পেতে ফুল-স্পীডে পাখা খুলে
ঘুম দিতে অনুরোধ করে,
এখনো সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা পৃথিবীর থেকে
অন্তর্হিত হয়নি—অথচ এই সবে
আমার কি লাভ? আমি সম্রাটের ক্ষুধা নিয়ে
এসেছি মৌমাছিতন্ত্রে—পলে অনুপলে
কেটে ছেটে ছোটো ক'রে ফেলা হচ্ছে আমার অসীম প্রাপ্যগুলি,
অঞ্জলি সমুদ্র ধরে কতটুকু? আমি বর্ধমান স্টেট থেকে
মহাকবিদের প্রাপ্য সাতলক্ষ টাকার ইজারা চাই—দীর্ঘতম রাত
বিলাসের চৌবাচ্চায় শুয়ে থাকব স্ট্র-পাইপ-মুখে।

মাথার ভিতরে
অসংখ্য পিনের মতো জেগে ওঠে শরবন হোগলা প্রান্তর।
তোমরাই আমাকে ছোটোবেলা থেকে 'ইশ, কি প্রতিভা.'
বেজায় আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছো, নষ্ট করছো, আমাকে আদরে;
তোমরা দেখেছো আমি কেমন বিপজ্জনক হয়ে উঠছি বছর বছর
মুখের ডিমেলা কান্তি ভেঙে যাচ্ছে,
বুড়োটে জটিল হচ্ছে স্নায় মাংস শিরা,
'খোকা' 'খোকা' ব'লে তোমরা আনন্দে ধেই ধেই ক'রে
নেচেছো দুপাশে,
আত্মীয়ের বাড়ী বাড়ী নিয়ে গেছো—বিবাহ দিয়েছো।
আমার সমূহ দোষ
গুণের টোপর প'রে ফিরে আসে তোমাদের মূর্খের সভায়,
চৌদিকে প্রবল গণ্ডগোল
যখন আমাকে নিয়ে, তোমরা বলছো 'সব-ই দুষ্টের প্রচার'

তোমাদের কতটুকু লাভ এতে জানি না—কেবল
আমার বেতন আমি পেয়ে যাচ্ছি একত্রিশ বছরে।

এত লোভে এত কম লাভে, ইচ্ছা ও প্রাপ্তির
এরকম ভয়াবহ নিষ্ঠুর ফারাকে, কোটি লাশের সংসারে
দ্বিগুণ জীবিত থেকে ত্বক ফেটে উরু ফেটে কটিদেশ ফেটে
মিছিমিছি অগ্নিস্রোত বয়ে যায়।
ফুলের ঠিকানা
বাড়ী বাড়ী পাওয়া গেলে, ছাদনাতলার ভালোবাসা
হাটে মাঠে বেশ্যালয়ে মদের দোকানে দুঃখী মায়ের অধরে
লেগে থাকলে ঢের বেশী ভালো হত—পরিণাম, পরিণাম করে
হা ঈশ্বর, জো হুজুর ক'রে
জোকারের চোঙা-টুপী এঁটে আর বেড়াতে হতনা এই ক্লীবের
সংসারে,
বেড়াতে হতনা আর
কিশোরীর হাত নয়, স্তন ছুঁয়ে সারা সন্ধে ফুটবল মাঠের নির্জনে।

শোক

মৃণাল বসু.চৌধুরী

এবং হলুদ ঘাগরার নীচে সেই সব রমণীদের সুঠাম
দেহবল্লরী কাঁপছিল আর ঘুঙুরের শব্দে শব্দে চতুর্দিক
ধ্বনিময় হলে তারা একে একে সমস্ত পোষাক খুলে
উড়িয়ে দিচ্ছিলো হাওয়ায়
চারপাশের হলুদ আকাশের নীচে তাদের
নিরাভরণ দেহগুলি কাঁপছিল এবং ময়ূরপঙ্খীর মতো
নাচতে নাচতে ভাসতে ভাসতে সমস্ত আভরণ উড়ে
যাচ্ছিল ক্রমশ উপরে
তারপর এক সময় বিস্মিত আর্তনাদে তারা
সকলেই শোক প্রকাশের জন্য নতজানু হতে চাইল

যৌবনোত্তর

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

কেন তুমি তুলে রাখো আকুল কথার এত সুর,
কেন তুমি চাও আজো হৃদয়ের হারানো উত্তাপ
হাতে হাতে কথা বলা তুলোট নরম স্নিগ্ধ চাপ
গানের হারানো বাণী গুণ গুণ কোমল মধুর
কেন তুমি জড়িয়ে ধরতে চাও অতীত সুদূর ?
যে গেছে যেতেই দাও স্মৃতির সে অবলুপ্ত সাপ
শিরশিরে ঘটনার স্তূপে থেকে কেন ছাড়ো হাঁফ ?
স্মৃতি হলো ছোড়া তীর—ফেরাবে কে এমন নিষ্ঠুর ?

আকাশে বর্ষণ শেষে সাদা মেঘ জমায় পসরা
কেন তুমি তার কাছে বর্ষণের আকাঙ্ক্ষা জানাবে ?
কেন সে মনের তটে মল্লারের গাইবে রাগিনী
প্রথম কদম্ব তার রোমাঞ্চের প্রণয়কেতন
উড়িয়ে সময় মতো যবনিকা টেনে দিয়ে যায়
প্রৌঢ়ত্বের মৃগনাভি গন্ধঢালে যৌবনের ধূপে।

শোক

রত্নেশ্বর হাজরা

চলা শেষ হয়ে গেলে দীর্ঘপথ পায়ের কাছে
পড়ে থাকে
চলা শেষ হয়ে গেলে
অস্থিরতা
সামনে পিছনে দীর্ঘতর পদধ্বনি
ডাইনে বাঁয়ে পথ
শেষ হলে একটা রেখা
আসা যাওয়ার উত্তরাধিকার
পড়ে থাকে চলা
শেষ হয়ে গেলে নীরব সূর্যাস্ত
পায়ের কাছে দীর্ঘশ্বাস
থাকে।

বাদর মেয়ে রাত ভরে কাল

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

আমি কি তোর সাগর সেচা
সাত রাজার ধন একটি মানিক,
যখন খুশি মাথায় রাখিস
ধুলোয় ছুঁড়ে দেখিস খানিক ?

ভালোবাসা এ কোন রকম,
খেলতে এসে আবোল তাবোল,
নিজেই কেঁদে লুটিয়ে পরিস
নিজের বুকেই মারিস ছোবল।

কে শেখালো এমন করে
আদর করার রকম-সকম,
পাগলী তোকে কে শেখালো
ভালোবেসে করতে যখম !

বাদর মেয়ে রাত ভরে কাল
কি করেছিস বৃষ্টি নিয়ে ?
চিঠির পরে চিঠি ছিঁড়ে
ঘর ভরেছিস কাগজ দিয়ে !

অহংকার

শুভাশিস্ গোস্বামী

'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'
বলে' আমি তাপস বালক
বুকের গহন থেকে অনায়াসে উঠে আসতে পারি।

গোপনে গোপনে খুব অহংকার জরিবুটি খেলে।
শিকড় ছড়িয়ে যায় দীর্ঘপথ, মাটির ভিতরে,

বুকের ভিতর কিম্বা শিরার ভিতরে, কোথাও কোথাও,
শিকড় ছড়িয়ে যায় সমস্ত ধমনীর ভিতর।
শিকড়ে যতেক জটিলতা।

সর্বস্বে উপড়ে নিতে পারি আমি সমূহ শিকড়।
বুকের গহন থেকে, শিকড়ের জটিলতা থেকে
তাপস বালক আমি
উদাসীন সন্ন্যাসে অনায়াস উঠে আসতে পারি।
কমণ্ডলু ভরে' নিতে পারি আমি
অহংকারহীনতার জলে।

মাধুকরী বৃত্তিপটু কাঙালের মতন
নামগান করে ফিরতে চাইনা কখনও।
(শুধু) অহংকারহীনতায় দীক্ষিত হ'তে চাই
নিজের কাছেই নিজে আমি।

মাছ মুরগী মানুষ ও পদ্মফুল

বিকাশ বসু

মাছ মুরগী মানুষ ও পদ্মফুল
আমরা এক গাড়িতে চলেছি
আমরা এক বাজার গাড়িতে চলেছি
সমস্ত ট্রেনটা একটা বাজার গাড়ি
আকাশের সব নীল মুছে যায়
এমন ঠাসাঠাসি সবাই
মাছ মুরগী মানুষ পদ্মফুল
আমরা সবাই এক গাড়িতে
মুরগীটা এখুনি আমায়
খেয়ে ফেলতে পারে
আমি তো পারিই মুরগীটাকে।

শেষ দৃশ্যপট

মৃণাল দত্ত

চোখের উপর থেকে মুছে যাচ্ছে শেষ দৃশ্যপট
শেষ নোঙরের পাড়—তা-ও মুছে যাচ্ছে, ক্রমশই
অদূর সীমান্ত রেখা কুয়াশা বিলীন
শেষ মানুষের হাতে শেষের নৈবেদ্য নিতে যেন ক্রমশই
চোখের উপর থেকে স্থির ও অম্লান দৃশ্যপট মুছে যাচ্ছে ক্রমশই
শেষ ঘর-বাড়ি—
গ্রাম-গঞ্জ, অদূর খামার
শেষ দৃশ্যমান গোলাবাড়ি
সব একে একে মুছে যাচ্ছে, ক্রমশই
শেষ স্বপ্নেরই হাতে শেষ অন্তিম শয্যা পাতি

শেষ দৃশ্যের কাছে শেষ অন্তিম স্বপ্ন রাখি
তবু ক্রমশই
চোখের উপর থেকে মুছে যাচ্ছে শেষ দৃশ্যপট—
এবং তুমিও।

যেন সেই তো আমার স্বভাব

মদনমোহন বিশ্বাস

জল ছুঁয়ে সেইতো একই বৃত্ত রচনা পাশাপাশি
কিনারে ভেঙ্গে পড়ে মৃদু ঢেউগুলি। তুমি ভাবো
বিন্দু বিন্দু এমনকি ক্ষয়ে যায় কিনার
যেন অভ্যাসে অবশেষে পার হয়ে যাবে
মিছে কানামাছি খেলা—ধরা না দিলে কেউ নাকি ছুঁতে পারে।
সমুদ্র শাসিত নয় ঢেউগুলি তোমার
যেন সেই তো আমার স্বভাব
এমনকি একদিন শুষে নেবে আমারই স্বভাব রোদ
সব ঢেউগুলি।

প্রভুর প্রতি নিবেদন

শংকর চট্টোপাধ্যায়

বুকের ভেতরে চড় মেরে বলো, 'বিশ্বাস বানাও'
মানুষের কাছে দয়া পেয়ে যেতে সুখ
বস্তুত আহ্লাদ হয়
ফানুস ওড়ালে।

কেমন বানালে বলো রক্তপিণ্ড, আকাশ পাতাল
এত চাও কেন তুমি ?
কী কী পেলে যাবে
বারুদে রেখেছো হাত, সাবধান তবে
নিজেকে ফেরাও
ক্ষমা চাও, কুর্নিশ জানাও
বাতাসে মাথাটা ঠুকে জিভ চাটো।
মানুষের ঘরে আজ সাপেরও বসত
এখন মেলে মা ভালো ফল
শুধু জল
মূর্খতাবশত আছে ছল
মূর্খতাবশত শুধু জল।

এখন বানাতে হলে পরস্পর মিশে যেতে হয়
মাটিতে মাটিটা হয়ে, ফুলে ফুল, পাতালে পাতাল
বস্তুত মাতাল
তরুণী নদীকে চেনে বড় কাছ থেকে।

বুকের ভেতরে চড় মেরে বলো, 'বিশ্বাস বানাও'
পেতে হলে নিজেকেই নাও
কেনা ফানুসের মত
লাল নীল যখন যেমত

"এখানে আমি" প্রসঙ্গে*

পরেশ মণ্ডল

জানি বাংলা কবিতা সমৃদ্ধ; মনে আছে তিরিশের কবিদের কথা, কিন্তু সাম্প্রতিককালে 'এখানে আমি' অভিনব এবং স্মরণীয়। পুষ্করের কবিতা এত স্বতন্ত্র যে, তাকে আবির্ভাব বলে মনে হয়। 'এখানে আমি'র যে কোন একটি কবিতার দিকে তাকালে বোঝা যাবে, এ কবিতা এর আগে লেখা হয়নি, এবং পুষ্কর ছাড়া আর কারুর পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল না।

ঘুমের গভীরে এই আবিষ্ট ভ্রমণ
স্বপ্নের গভীরে দীর্ঘ আবিষ্ট ভ্রমণ (ঘুমের গভীরে)

অথবা—

নীলিমায় উড়ে যায় শ্বেত ময়ূরেরা (শ্বেত ময়ূরেরা)

'এখানে আমি'র মধ্যে কবির স্বপ্নের গভীরে দীর্ঘ আবিষ্ট ভ্রমণ—এটিই গ্রন্থের আত্মিক পরিচিতি। সমস্ত কবিতা যেন আবিষ্ট এক স্বপ্নদর্শীর রচনা; রহস্যময়, জটিল, অনায়াস এবং অন্তরঙ্গ।

পুষ্কর দাশগুপ্ত ইনট্রইটিভ ধারার কবি, তার হেরমেটিক প্রবণতা লক্ষ্য এড়ায় না। কখনো কখনো সুররিয়ালিস্টদের কথা মনে এলেও সে দলে চিহ্নিত করতে বাধে। আসলে এ কণ্ঠস্বর তার নিজের। পুষ্কর আত্মমগ্ন কবি।

'এখানে আমি'তে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে, চরিত্রে আবদ্ধ হয়ে যায়নি। পরিচিত শব্দকে মায়াবীর মতো যাদুবলে কবি নিজস্ব উত্তাপ দিয়েছেন। শব্দগুলি কবিতার বিশেষ আবহে মর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র। চিৎকার বা উচ্চস্বর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান না। স্বগতভাষণে মগ্ন; কোথাও আত্মঘোষণা নেই, অথচ আত্মানুসন্ধান আছে। তার কাব্যের বিষয় 'আমি', 'এখানে আমি' তাই গ্রন্থটির দ্যুতিপ্রতীক। এ নামের শেষ কবিতাটি পুষ্করের স্বাভাবিক বিশেষত্বে কুণ্ঠাহীন। সরল সহজ অথচ ঋজু তার ভঙ্গি, প্রতিটি লাইন কবিতা হতে দূরে থেকে স্পষ্ট করে দৃঢ়ভাবে উচ্চারিত অথচ তাতে মিশে আছে কবির inner soul-এর ক্ষতমুখনিঃসৃত

*এখানে আমি: পুষ্কর দাশগুপ্ত। প্রকাশক: তপনলাল ধর, অব্যয় ৪২, গড়পা রোড, কলকাতা-৯। দাম: দু' টাকা

রক্তের চিহ্ন, বিষাদ এবং নৈরাশ্য। আরোপিত দর্শনে তার স্বস্তি নেই। তাই বলেন 'কে কে কে এসে আমায় বলে দেবে কোন দিকে পথ'।

আমি আর কিছুই স্পষ্ট করে বলতে পারি না
আমার জিব অনড়
আমি আর কিছুই করতে পারি না
আমার শরীর অসাড়

পল ক্লোদেলের Tete d'or (Me voici)র সঙ্গে কবিতাটির সাযুজ্য আছে। পুষ্করের অবচেতনেই হয়তো এ ছায়াপাত। তাই এ উচ্চারণ শ্লাঘারঞ্জিত। কেননা ক্লোদেলের সঙ্গে এ কবির মিলের চেয়ে অমিল বেশি।

কোন কোন কবিতায় তার 'আমি' এক ধরণের objectivityর আড়ালে আত্মগোপন করেছে। অনেক কবিতা শেষ হয়নি মনে হয়েছে; অথচ বিস্তারে অতিকথনের ভয়, পতনের আশঙ্কা, তবুও অতৃপ্তি থেকে যায়। কবি আত্মরক্ষা করতে জানেন। এটা বরং কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। প্রচলিত উপমার ব্যবহার ক্বচিৎ লক্ষে এসেছে।

পুষ্কর নিজে অত্যন্ত বিদগ্ধ। কিন্তু কোন কবিতা পড়ে তা মনে হয় না, এমনি সহজ তার প্রকাশ। কবিতার ভঙ্গি অনায়াস, কোথাও কৃত্রিমতা নেই। বাহুল্যবর্জনে কবি নির্দয়, চটকদার বাক্যবন্ধে বা পরজীবী সংস্থানে আস্থাহীন। তার কবিতা পড়তে পড়তে আমার মনে এসেছে কোন প্রাচীন বুদ্ধমন্দিরের কথা, ধূপধুনো এবং ত্রিশরণ মন্ত্রের বিলীয়মান উচ্চারণ; আর সে মন্দিরের গায়ে অস্পষ্ট প্রাকৃতিক মুখচ্ছবি, যাদের আমি চিনি না, কখনো দেখতেও পাবো না—অনেকটা যেন রবীন্দ্রনাথের ছবির সেই প্রাগৈতিহাসিক মুখ। প্রসঙ্গত 'বনপথে মন্দিরের পথে' কবিতাটি স্মরণ করা যাক।

কেউ নেই কেউ নেই কেউ নেই
তিব্বতী ঢোলের শব্দে
গোল সূর্য ভেঙ্গে পড়ে মন্দির চূড়ায়
.....
বুদ্ধ মন্দিরের গায়ে
জেগে ওঠে সাতশ কিন্নর

এ কবির কবিতা মন্ত্রের মতো শুদ্ধ, তাতে বাস্তব উচ্ছ্বাস ও সেন্টিমেন্ট নেই, আছে স্বপ্নের নীলাভিসার।

রাজার প্রাসাদে হবে বারুণী উৎসব।
আমন্ত্রণলিপি দিয়ে গেছে। (আমন্ত্রণ

এ কোন রাজা? ডাকঘরের? ক্লোদেলের Dieu? তাহলে? কিন্তু তার খোঁজে কি লাভ! আর পুষ্করের কবিতা তথাকথিত দর্শন-তত্ত্বের আধারমাত্র নয়, কবিতা। 'কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ' যদি কবিতার অবচেতনে থেকেই থাকে তবে তা 'সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো'*। তা অনুভবের অপেক্ষা রাখে, চিন্তার নয়।

ভিন্ন কবিতায় ভিন্ন রীতি। 'ওরা কখন'-এ

ওরা কখন ফিরে আসবে
জানি না
কখন গেল
জানি না
কোনদিকে গেল
জানি না

প্রসঙ্গত 'ফিরে ফিরে', 'পথের দিকে', 'এই শহর' প্রভৃতির কথা মনে করা যেতে পারে।

সমস্ত দিকেই বাজে অজস্র ব্যাকুল করতাল।

দীপ্ত হয় চকিত সংকেত
অগ্নি
জল
ঐ চক্র
তীব্রগতি ঘোরে
(প্রস্তাবনা)

'অলিক এবং উপলব্ধির অদ্বৈত সিদ্ধিই সার্থক কবিতার সৃষ্টি করে। সার্থক নতুন কবিতার অঙ্গীকারে থাকে নতুন আঙ্গিক। স্মরণীয় র‍্যাঁবোর সেই বিখ্যাত পত্র, যেখানে তিনি বলেছিলেন 'অজ্ঞাতের আবিষ্কার নতুন ফর্মের দাবী করে'।

*কবিতার কথা : জীবানন্দ সাশ

এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তার নিজের কবিতাগুলি সম্পন্ন। অভ্যাসজীর্ণ প্রকরণে মুক্তি নেই, তাই নতুনের অন্বেষণ, এ ব্যাপারে কবির গোঁড়ামি নেই! লাইন ও শব্দ ভেঙে সাজিয়েছেন। শব্দকে যোগ্যমূল্য দেবার প্রয়োজনে বড় হরফের ব্যবহার করেছেন; কবিতাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দিতেও তার কুণ্ঠা নেই। কিন্তু লক্ষ্যণীয় কবির সংযম আছে। কোন কবিতায় যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন নি। Trained পাঠকের জন্যে তার কবিতা, বুঝতে পারি।

চিত্র নয়, সংগীত পুষ্করের কবিতার প্রাণ। মন্ত্রোচ্চারণের মতো বিজড়িত গভীর এক সংগীত যেন বেজে যায় সবার অগোচরে। কবিতার লাইন বা শব্দ গানের ধুয়োর মতো ফিরে ফিরে আসে, গ্রস্ত করে, ভেতরে ভেতরে স্পন্দন জাগায়, আমরা অনুভব করতে পারি। স্বভাবে কবিতাগুলি ধীর, নিবিড় এবং অন্তর্মুখী। তাই তানপ্রধান ছন্দেই কবির অনায়াস পরিক্রমা; ভাঙা পয়ারে এগুলি স্বচ্ছন্দগতি। অন্য ছন্দেও দক্ষতার অভাব নেই,—একাধিক কবিতা ছড়ার ছন্দে দ্যোতিত। 'অসুখ' পাঁচ মাত্রার ধ্বনিপ্রধানে রচিত হয়েছে। গদ্যছন্দের নৈপুন্য ও বর্তমান।

প্রত্যেক কবির কিছু শব্দের প্রতি মোহ থাকে—এবং সেই শব্দের ঠিকুজি সন্ধানে বেরুলে স্বভাব ও কবিধর্মের অনেক গোপন উৎস আবিষ্কার করা যায়। পুষ্করেরও আছে, আর সেই শব্দটি—ছায়া। তাছাড়া আলো, অন্ধকার, কুয়াশা, রাত্রি, মন্দির ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে যে অনুষঙ্গ মিশে আছে তা রহস্যময়, স্পর্শকাতর, বাস্তবোত্তীর্ণ, অনির্দেশ্য এবং বিষাদমগ্ন। সে কারণেই কাব্যস্বভাবকে ধারণ করার স্বাধিকার পেয়েছে। তবুও বলবো, ছায়া শব্দটির বহুব্যবহার আমাকে ক্লান্ত করেছে। তাতে বিশেষ উপলব্ধি বিশেষ থাকেনি, প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করতে সর্বদা সার্থক নয়। এমন ভালো কাব্যগ্রন্থে এটুকু ত্রুটিও অমার্জনীয়। অন্তত পুষ্করের মতো কবির পক্ষে, যার গৃহিনীপনার অভাব চোখে পড়ে না।

শব্দব্যবহারে কবি সিলেকসনের পক্ষপাতী এবং বিশেষরকমের। তাই অভিনব শব্দসঞ্চারের প্রবনতায় অনুষঙ্গরিক্ত শব্দকে আমল দিতে চান না। তবে এ ব্যাপারে আর একটু উদার হলে ক্ষতি হতো না মনে হয়।

'এই শহর' 'চিৎকার' কবিতাদুটি অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম বলেই গ্রন্থভুক্ত না হলে খুশি হতে পারতুম।

মানিকলালের তন্ময় প্রচ্ছদ নিয়ে 'এখানে আমি' গ্রন্থটি সাম্প্রতিকের ঈর্ষণীয় কাব্যসংকলন। অবশ্য উল্লিখিত সামান্য কিছু ত্রুটি আছে, কিন্তু সেটুকু মান্য, কেননা 'মানুষের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিও অসম্পূর্ণ; এবং এমন শিল্পসামগ্রী বিরল যা আদ্যন্ত অনবদ্য অথবা যার শ্রীবৃদ্ধি অভাবনীয়।'*

* মুখবন্ধ (সংবর্ত)। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

প্রবাসী

আঁধারে কেটেছে কাল। সরাইয়ের প্রবাসী আশ্রয়ে
আমার স্বদেশ ছিলো,
দূরতম দৃশ্যের মতন
সবুজ রৌদ্রের স্মৃতি। আজো দূর মেঘের বর্ষণে
বৃক্ষের শরীর ছুঁয়ে—
বেজে ওঠে উৎসবের ঋতু।

বন্ধু হে কোথায় আছো! অন্ধকারে সরাইখানায়
এখনো প্রবাসী আমি। চতুর্দিকে
রোদ্দুরের পাখি উড়ে যায়।

চিরকাল

একটি দীর্ঘায়ু নারীর ছায়া
পড়ে আছে
পুকুরে—
একটি দীর্ঘাকার পুরুষের যন্ত্রণা
দিনের পর দিন
রাতের পর রাত
হলুদ পাতার মতো ঝরে পড়ছে।

আশ্বিনে

আশ্বিনে, মাঠের মধ্যে
ছড়ানো আকাশ। দুপুরে
রৌদ্রের মধ্যে কাশবন। নদীতীরে
পাখির পালক
এবং ধানের ক্ষেতে রেণুমাখা নবান্নের হাওয়া।

চিৎকার করো না কেউ

চিৎকার করো না
কেউ। কেঁদো না
চোখের জলে
জাহাজ বোঝাই ..
এখন করো না
কেউ! যাত্রি টলোমল
পাটাতনে—
দিনরাত বুকের কম্পন!

মাঝরাতে: বর্ষণ-শেষে

সারাদিন বৃষ্টি ছিলো, সারা সন্ধ্যা
রাত্তিরের
প্রথম প্রহর।

মাঝরাতে হেসে ওঠে
এক নারী
ছুড়ে দিয়ে
নদীজলে মেঘের কাপড়।

স্মৃতি

রোদ্দুরে শুকায় চোখে জল। স্বপ্নগুলি
মেঘে ভাসে
যেন ভোর, শৈশবে শরীর টলোমল।

শরীর যেন বাঁশির মতো

শরীর যেন বাঁশির মতো
বাজতে থাকে। দুপুর রোদে—
একটি পাখি
বাজায় নূপুর
নৃত্য করে।
শরীরটাকে রাখবো কোথায়? কিসে ঘিরে?
দেহের ভেতর এখন জ্বলে
ঋতুর শিরা। দুই প্রহরের কঠিন তাপে
আগুন জ্বলে
কথার মতো, ধ্বনির মতো—
একলা ঘরে।
হাত ছোয়ালেই শাড়ির আঁচল
রৌদ্রে কাঁপে। হাওয়ায় হাওয়ায়
বুক ভরে যায়—
সারা শরীর বাজতে থাকে।

যখন শ্রাবণ রাত যায় যায়

যখন শ্রাবণ রাত
যায় যায়
আশ্বিনের মেঘ
পাল তুলে দিয়েছে আকাশে
আর—

অতিদূর নক্ষত্র সভায়
বিপুল উৎসব-আয়োজন

তখন কোলকাতা থেকে দূরে
আমি একা জেগে আছি
সেতুর ওপরে
কুয়াশায়…

এখনো তোমার দাবী

এখনো তোমার দাবী : রৌদ্রের মিছিলে
ভোরবেলা
নিশান ওড়াতে যাবে—সমতলে,
বৃক্ষের ওপরে
এবং
সারাটি দিন, ক্লান্তিহীন, রোদ্দুরে পোড়াতে
বুকের সঙ্কল্পগুলো
দুয়ারে দুয়ারে।

এখনো তোমার দাবী : মাঠে মাঠে, নদীর শরীরে
সূর্যের শরীর দেখবে। বিকেলেও
পর্বতে মিনারে
রৌদ্রেরই বিস্মিত দ্যুতি—
নারী কিংবা ঘরের গভীরে।

নিচু পথে আরো নিচু…

একটি পোষাকই শুধু ছিলো কি তোমার—
হলুদ রৌদ্রের মতো
বিষাদের শাড়ি! অশ্রুময়
সন্ধীতের নিজস্ব উৎসবে নিমন্ত্রণ—

ছিলো কি তোমার ? তুমি স্নান করবে বলে
স্বচ্ছতর জলে
পায়ে পায়ে নেমেছিলে। আত্মীয়তা
ছিলো কি তোমার —
রুপোলি মাছের সাথে ? নিচু পথে আরো নিচু
হয়ে যাও সে কোন্ বিষাদে ?

পথ

সরাইখানার পাশে
পথ
পদচিহ্ন
চলে গেছে এঁকে বেঁকে…

ছায়ার আড়ালে জ্যোৎস্না
পথ
দুয়ারে দুয়ারে দিনরাত
সূর্য ওঠে
অস্ত যায়
মসৃণ মসৃণ এক জলের প্রপাতে

এ পাশে শহর কোলাহল
ওপাশে অরণ্য নিরবতা

সরাইখানার পাশে
পথ
পদচিহ্ন
চলে গেছে এঁকে বেঁকে…

ঘরে যখন আগুন জ্বলছে

ভীষণ আগুন জ্বলছে
ঘরে। সমস্তই চেনা যাচ্ছে :
নাম, প্রেম, ভালোবাসা
বিবিধ সঙ্কেত—
উজ্জ্বল পাখির মতো রৌদ্রের পাতাকা।

এখানে দাঁড়ানো যায় না। অন্ধকার
ঢাকা যায় না। চোখ বন্ধ করে
কোনো চিহ্ন মোছা যায় না। চতুর্দিকে
চিত্রাবলি, নিজস্ব স্বাক্ষর।

ভীষণ আগুন জ্বলছে
ঘরে। আশ্রিত বিশ্বাস পোড়ে—
চতুর্দ্দিকে—
প্রিয়তম, সঞ্চিত আঁধার।

বৃষ্টি পড়ছে সারাদিন

বৃষ্টি পড়ছে। সারাদিন
মৌসুমী শিশুরা
শার্সিতে হাততালি দিচ্ছে। মাঠের ওপরে
সমুদ্র শঙ্খের স্বর—
ডাক দেয়, বৃক্ষের শিশুকে :
এবার বর্ষার খেলা শুরু হবে তোমাদের সাথে।

বৃষ্টি পড়ছে। সারাদিন
বৃষ্টির শরীরে
দ্বিতীয় জন্মের কান্না—
বীজের অঙ্কুরে।

গাছের ছায়ায় এলেই

আমি গাছের ছায়ায় এলেই
বৃক্ষের শরীরে
জলের কল্লোল শুনতে পাই। বৃষ্টি পতনের ধ্বনি
মন্দিরের ঘণ্টার মতো
চতুর্দ্দিকে—
মেঘের ঝালরে
আমি চিত্রিত পাখির খোঁজ করি।

মাঝরাতে

মাঝরাতে চাঁদ উঠলো
আকাশে। তোমার
রুপোলি মুখের দ্যুতি—
শৈশবের মতো
অম্লান সময়ে ভেসে যায়…

সাড়া দাও

তুষার রায়

কে কোথায় আছো সাড়া দাও দেখছো না
চারপাশে ঝুপ ঝুপ করে নামচে ফগ
পাহাড়ী রাস্তা জীগজ্যাগ পদে পদে বাঁক
কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা।
ওপরে খাড়া গা পাহাড় থেকে কি ধ্বস নামবে
কে কোথায় আছো সাড়া দাও, বন্ধু হওতো
হাতে হাত দেবার জন্য এগিয়ে এসো, শত্রু হওতো
খাপ থেকে ছুরি খুলে তৈরী হও
বন্ধু বা বৈরী নাগা যেই হও সাড়া দাও
দেখছোনা চার পাশের দেওদার পাইন পথ অদৃশ্য
দেখছো না কুয়াশা চাপ চরাচরে হাওয়াও চলছে না।

দুটি কবিতা

সত্যেন্দ্র আচার্য

ভালবাসার সাক্ষী

অনেক সুগন্ধি পুষ্প জড়ো করা হলে
ছাখো, কটা প্রজাপতি আসে।
ছাখো, ভ্রমরই বা কটা।
একদিন প্রখর রোদে চতুর রং
বিড়ম্বিত মনে হবে দেখো।

তখন চোখ বুজোও, জানবে—
যুদ্ধ—মানুষের
বিভ্রম—চেতনার
যৌনতা—উপসর্গের
কোরান, গীতা, বাইবেল—দুর্বলতার।
শুধু ভালবাসার অর্থ, ঋজু ঝর্ণার জলে
লেখা আছে।

ভালবাসা পাওয়া যায় না

কৈশোরে আমার প্রতিবেশী ছিল একটা বাড়ন্ত
ডুমুরগাছ। রোজ শনিবার দুপুর পার হলেই
স্কুলে ফিরে দেখতাম কিছু কর্কশ পাতার ছায়া
অনাদরে আমার নরম বালিশে মুখগুঁজে শুয়ে আছে।
আমি অভিমানে বালিশে মুখ গুঁজে একটা নিটোল
ছায়া খুঁজতাম।

আজ "কৈশোর" যেন ডুমুরের ফুল।
"আজ" যেন সেদিনের কৈশোর।

বলেছিলে

শ্যাম রায়

তুমি না সেদিন বলেছিলে
"আর চলতে পারা যায় না"!
কি যে তোমার চিক চিকে আশা।

ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ—তোমার যোগ নয়,
মানুষ হয়ে ভগবানের চাকরি ফট্ করা
দরকার কি? থাক সে সুখে শান্তিতে।

পথ চলার জ্বালা, পকেটে বন্দী আগুন
হাত পুড়িয়ে, যকৃতে ছ্যাকা লাগায়।
রক্তটা উল্টো ছোটে—হৃদয়ে অবরোধ।

এখনো তোমার বলা শেষ হয় নি
তোমার আরক্ত উদ্বেগ
একটা দর্পনের সামিল।

তুমি না সেদিন বলেছিলে
"এই জ্বালার শেষ হবে। দিনটা পেঁয়াজের খোসা
খুলে খুলে যাবে জলন্ত তেলে।"

আকাশের ডিম, মাটিতে তার কুসুম হয় না
ঘুনে ধরা কাঠ গুড়ো হয়ে যায়
মাথার ওপরে যতই ঢাকা দাও—বজ্র ঝোলে।

তুমি সেদিন বলেছিলে, কিন্তু
মানুষের পোকা লাগা হাড়গুলো
এখনো বজায় সহরে, বন্দরে, গাঁয়ে।

অথচ টিকে থাকার আমেজটা বানচাল
কিন্তু আকড়ে আকড়ে তার জন্যে
সে শুধু কোথায় যে বাড়ছে আর বাড়ছে।

আগুন যখন সুরু হবে, তোমার যকৃত চলবে
হৃদয়ে হৃদয় মিশবে আঘাতে আঘাত
কারণ এখন সবই বারুদের স্তূপে জমছে জমছে।

অনুভব সুক্তাবলি

বঙ্কিম মাহাত

১.

সূর্য উত্তাপ ছড়ায় ছাখো তার বুকে
প্রেমিক চিরকাল সয়েছে যন্ত্রণা কী-যে,
বলে নি, বড়ো দুখ, বলে নি, বড়ো সুখ. এসো
আমার সুখে দুখে অংশ কারা নেবে. এসো।

সূর্য নিয়মিত হৃদয়ে রাখে তার তাপ
প্রেমিক নিবেদিত প্রচুর বিশ্বাসে কবে,
নিবিড় সুখে-দুখে আত্মহারা উচ্ছ্বাসে
কেবল ছবি আঁকে, যে-ছবি তার ছায়া ধরে॥

২.

শবরী অনুপলে বিবশ তনুভার
সাগর সংগমে পিপাসা অসীমিত ;
কাননে ফুলরাশি ছাখো রে জলে যায়
নিথর চেয়ে আছি শরীরে অবসাদ।
নিবিড় প্রতীক্ষা ঝরালো না
আহারে আহা শুধু, জটিল হাহাকার।

ময়না চন্দনা শোনাবে সংগীত
মেহেদি ভরে যাবে জ্বালানো সৌরভে—

হায়রে হায় সব নৈশ স্বপ্নালি :
গভীরে প্রোথিতা সাগরে দূরায়ত।
আহা রে আহা আহা, প্রেমিক চিরকাল
আকাশে লিখে রাখে তারার বর্ণালি ॥

৩.

সুউচ্চ পর্বতশীর্ষে আমার দৃষ্টিকে প্রসারিত
রেখে নিঃসন্দেহ আমি পতনের অনিবার্যতাকে
ভেবেছি করেছি জয় ; উজ্জ্বল সূর্যের রূপস্রোতে
তোমাকে প্রতিমা গড়ে নীল ইন্দিবর সহযোগে
সন্নিহিত প্রেমালাপে প্রকৃতির অস্তিত্ব ভুলেছি

তারপর মনে হোল আমি কোন নির্ঝরশিকরে
বিলুপ্ত হয়েছি স্থির ; পর্বতশীর্ষের অবসান
ঘটেছে অনেককাল, সূর্যাংকিত তোমার প্রতিমা
দগ্ধ ম্লান বিষণ্ণতা ; স্মরণের চতুর নায়ক
তোমাকে করেছে মুক্ত, আমি খিন্ন মৃত ইতিহাস।

৪.

সহস্র আনন্দ হেতু তোমাকে ভেবেছি
আলোকিত সমন্বয়ে হীরের মতোন ;
তারপর আজ ছাখো বিদায়ের কাল
দুয়ারে প্রতীক্ষা-রত : তুমি নিরুত্তাপ
দৃষ্টিতে কখনো বিদ্ধ করেছ আমাকে,
ইদানীং কোন কিছু জলে না তেমন।

পুনশ্চ আপন গৃহে ফিরে যাব একা
বিষণ্ণ পথিক ; আর কোনদিন জানি
মেহেদির গন্ধসুধা উতল হবে না ;
পরিচিত বন-ডুংরি, গাছপালা, পাখিদের ভিড়
আমার শ্রবণে এসে তোমার কাহিনী
বলবে না ঘনিষ্ঠ কোন প্রেমিকের মতো।

ঘেরাও, কেবল ঘেরাও

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

আমি কালো কাপড়ের নীচে আড়ষ্ট ছদ্মবেশীর মতন বসে থাকি
নির্জন দুপুর একা পেরিয়ে যেতে বড়ো কষ্ট হয়
কে যেন কবে বলেছিল, একটু অপেক্ষা করো. আসছি।
কে যেন বলেছিল, কাল এলে না কেন ?
সমুদয় অপেক্ষা সাজিয়ে রেখেছি আমার শুকনো বাগানে
শুকনো বাগানে কেবল গোলাপ কাঁটা
গোলাপ কাঁটা দিয়ে শোকগীতি কে আমার বুকে বিঁধিয়ে দিলো

বুকে আমার চৈত্র আগুন ; ভীষণ সে এক চৈত্রের শালবন
ঠাণ্ডা চশমা দিয়ে তুমি কি ভোলাতে চাও হাসি ও গর্জনে ?
আমি এক আততায়ীকে ধরতে চেয়েছি যে স্বপ্নে দুর্ধর্ষ
নরম সবুজ আলোর সেই হোটেলের বিউগল্‌বাদিনী
আমায় ফুল সাজানো শিখিয়ে দেবে বলেছিল,

আমি নিরুপায় বসে আছি
এই চৈত্রে আমার বুকের চারপাশে ঘেরাও কেবল ঘেরাও।

সময় এবং আলোকবর্তিকাবিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

কি আছে ওখানে তুমি কেন যাও। ঈপ্সিত দৃশ্য
অবলোকনের এত সাধ ভাল নয়।
যেহেতু অস্পষ্ট সমস্ত দৃশ্যে তুমি ইচ্ছার নানারূপ শুধু
উপভোগ করে যেতে পারো,
সমাহিত তোমার চেতনা ভাবলে অদ্ভুত দেবদেবীদের কথা মনে পড়ে,
দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ অনুশীলনের অন্তরালে
বিশেষ ইচ্ছার ক্ষেত্রে
আত্মহননের সাধ পান।

মূলত ইচ্ছা ফলবতী হোক এ আগ্রহ দীর্ঘকাল
জীওনো যাবে না জেনে
কি আছে ওখানে তুমি কেন যাও।
ঈপ্সিত দৃশ্য অবলোকনের এত সাধ ভাল নয়।
যেহেতু অস্পষ্ট সমস্ত দৃশ্যে তুমি ইচ্ছার নানারূপ শুধু
উপভোগ করে যেতে পারো
চেতনায় দেবদেবীগণ কিংবা সহস্র ইচ্ছার স্মৃতি নিয়ে,
ভালবেসে, ইদানীং আমি সব বৃক্ষদের চরিত্র বুঝেছি।

বাজার ভেঙে গেলে

কৃষ্ণ সাধন নন্দী

বাজার ভেঙে গেলে খেয়াল হয়।
কে মাঝি? কে দাঁড়ি? কার দোষে ভরাডুবি?
অসংখ্য কীটে ঘর ভরে গেছে। দাঁতাল স্বভাবে
দাবাগ্নি জ্বালতে যাবো
কুৎসিত ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা ঠিক,
তখন দর্পনে হিসেব করে চমকে উঠি।
দোষ ক্ষুধা—ভিতর পকেটে লুকিয়ে
রেখে স্বেচ্ছাচারী ঘোড়ার মতন
ঘুরে বেড়াবো। আমার
হাতে যন্ত্রবলে—
বুকের উপর ট্রেন চালাবো?
ফাঁকি দিলেই পালাবো কী করে!
ইন্দ্রিয়ের মেশিন গান থাড়া
আমি যে কোনো মুহূর্তে বন্দী হবো।

আখ ও আধ পাগলা ছেলেটি

ক্ষিতীশ দেব সিকদার

আধপাগলা ছেলেটি যখন যায় যাওয়ার জন্য যায় যখন আসে আসার জন্য আসে
মুখে সর্বদাই একটি আখ সে থু থু ছিটিয়ে চিবোয়
গড়িয়ে কিছু রস বুকের কাছে জামায় এসে লাগে

সেই জামাটা তাকে কে কিনে দিয়েছিল জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয় না
হেসে লুটিয়ে পড়ে
কাউকে কিছু বলার দায় তার নেই
সে কেবল থু থু ছিটিয়ে আখ চিবুবে এবং যখন-যার তার কথায় আসতে
অন্য বা ভিন্ন মানেগুলো যে-যার অভিরুচি অনুযায়ী অনুমান মাত্র

শুধু একটা আখের জন্য আধ পাগলা ছেলেটি আসার জন্য আসে, যাওয়ার জন্য
যায়
কখনো কখনো পথ চলতি ঐ বসানো লাঠিটা ভর দিয়ে হাঁটে
আবার বিপদ দেখলে মারণাস্ত্রের মত মাথায় তুলে ব্যবহার করে
(যে অদৃশ্য মাছিগুলো বন বন করে তার ঠোঁটে মুখে উড়ে আসছে
সেই আক্রমণ থেকে বাঁচতে চায়, বাঁচাতে চায়)
আধপাগলা ছেলেটি ভারী অবাক হত
কেমন করে আখগুলি অক্ষত রেখে চিবিয়ে বুকের কাছে জামা ভিজিয়ে দিত
এই কথাটা কেউ কোনদিন তাকে জিজ্ঞেস করল না!

আমায় কবি হতে দাও

শম্ভু রক্ষিত

বড় দীর্ঘদিন ধরে নিজের দুঃখকষ্টের ভালবাসার আধপোড়া হৃৎপিণ্ডের বিমর্ষ
অবসাদে কবিতা লেখার জন্যে
শূন্য শ্মশানে নিরাশ্রিত কুকুরের মত আর্তনাদ করতে সম্মত আছি
কাল সারারাত রাত্রিদিনের বিষয় হৃদয় পেয়ালায় উপচেছিল আবেগ
আমি আজ হতবিহ্বলভাবে পুড়ে মরছি, চিৎকারের ভাষা ভুলে যাচ্ছি শব্দহীন
প্রেমেরও
জোনাকিবিহীন অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছায়াহীন এক জগতে তলিয়ে যাচ্ছি
অথচ কাল আমি শরীরের রং কিছু স্মৃতি ধোয়া জ্যোৎস্নার জল রেখে এসেছি
নিঃশব্দ ঈথরে।

আমি এখন রক্তমাংস শূন্য মৃতপ্রায় ধ্বনি শুনছি
বুকের ভেতরে অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করছি আমি
আমার শরীরের কয়েক হাজার শিরা-উপশিরা থরথর করে অনবরত কাঁপছে
আমি ক্ষমা প্রেম মানবতা অভ্যাস করছি

আমার অসুখ বিষণ্ণতা দীর্ঘশ্বাস দাউদাউ করে গ্রীষ্মের হাওয়ায় পুড়ছে
দূরে রাজধানী থেকে আসছে আহ্বান দীপ্ত কলরোল
আমি এই রূঢ় পরিবেশে সামগ্রীবিহীন তৃষ্ণা নিয়ে আছি
আমার বিচিত্রমুখে জাহাজের তুমুল গম্ভীর শব্দ, নদীর কলতান
টেলিভিশনের মত প্লুত অন্ধকারে ভেসে উঠছে আমার রহস্যময় ছবি
স্থূল সভ্যতা থেকে খড়কুটো খুঁজে আনছি আমি
আমি এখন হিয়েরোগ্লিফিক্স্ অক্ষরে প্রখর উত্তাপের মত একটি কবিতা লেখার
কথা ভাবছি।

অথচ কাল আমার সিগারেটের ধোঁয়া ঝাউবনের ভেতর এবং আমার শরীরের
শিরা-উপশিরায় সিঁধিয়ে যাচ্ছিল
সোনাগাছিতে বেশ্যার হেফাজতে হাওড়ার বড় পোস্ট অফিসের সেই কাল
সীলগুলোর মতন।
আমি স্পষ্ট করে অবশ মোমের মত শূন্য মাঠের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম
অনন্তরাত্রির ঠাণ্ডা নিদারুণ এক দৃশ্যহীনতায় ছুঁড়ছিলাম ঢিল
মাতালের, ভিখারীর মত—

যদিও আমার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে শান্তি স্মৃতি বোধ বিস্ময়
অভিমানের স্পষ্ট শব্দ পথের দু'পাশের পরিচিত দৃশ্যপটের কোন
সম্পর্ক ছিল না।
আমি তখন লাজুক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম : আমাকে কবি হতেদাও
বুক পকেটে লুকিয়ে নিচ্ছিলাম দারুণ যত্নে লেখা একটা কবিতা
আমি তখন গ্যাগরিণ সেফার্ডের অনন্ত শূন্যেতে পাড়ি দেওয়ার তারিফ
করছিলাম
ভাবছিলাম আমিই আমার দুঃখ নির্বাসন বিষাদ বিষাক্ত ক্ষত পাপ
মেঘের মধ্যে মেঘ পাহাড়ের উন্মত্ত পথ—কবিতা আর আমি চলছিলাম যেন
উদ্‌ভ্রান্তের মত
চোখের সামনে ভয়াল এক দানব ঢক্‌ঢক্ করে স্পিরিট গিলে হা হা করে
হাসছিল

মুখোশে তার আহ্লাদি মুখ যাচ্ছিল না ঢাকা
তবু যেন অন্ধকারে আমার সমস্ত শিথিল ইন্দ্রিয় চকিতে সতর্ক হয়ে জেগে
উঠছিল
আমি দুঃস্বপ্ন দেখার মত আর্তভাবে ডুকরে ডুকরে উঠেছিলাম
রাত্রির ব্লাইফার্মেসের খাপখোপে ঢুকে যাচ্ছিলাম নির্দেশ মাফিক মৃত্যুতে।

———

কবিতাবলী

কৃষ্ণ ধর

আমার হাতে রক্ত

আমাকে ডেকো না তুমি, আমার হাতে রক্ত
ফুলটাকে আড়াল করে রাখো,
ওর গায়ে লাগবে।

আমার চোখের দিকে তাকিও না, সেখানে ভয়
আমি কোন মুখে আর তোমার দিকে তাকাবো।
আমি পিছু হটছি, পিছনে দেয়াল
দিনটা যেন দৌড়চ্ছে আমাকে ধরতে
অন্ধকার তার কর্কশ চাদরে ঢাকা দিক আমাকে
আমি তার নিচে মুখ লুকোতে চাই।

নাম ধরে আর ডেকো না তুমি, আমি চমকাই
তোমার ভালবাসার মালাটা ফিরিয়ে নাও,
এত রক্ত লেগে আছে আমার হাতে
ফুলগুলি তাতে ভিজে নোনতা হয়ে যাবে।

আমি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি নিঃশব্দে
মৌন ষড়যন্ত্রের পাঁচিল আমায় বন্দী করুক
আমায় ডেকো না তুমি, ব্রহ্মপুত্র
তোমার স্রোতে আমি কখন পবিত্র হবো!

উঁচু গলায় কে গান গাইছে,
ভাই বলে কা'রা আমায় ডাক দিল

আমি স্বেচ্ছাবন্দী হলাম নরকে
উজ্জ্বল মানুষ হে, আমায় করুণা করো॥

বিস্ময়ে রামধনু

কখন তুমি ডাকলে আমায়, বিস্ময়ে চোখ মেলে
কখন তোমায় দেখবো বলে আমি,
চলে গেছি স্রোতস্বিনী, তোমার জলের ধারে
সন্ধ্যা কখন হায়রে এল নামি।

ডাকবে বলে পাহাড় থেকে নিচে এলাম ছুটে
তোমার স্রোতে অজস্র ঢেউ ভাঙা,
হারাই যদি তোমার বুকে শৈশবের স্মৃতি
সকাল দুপুর তোমার মনে রাঙা।

হায়রে আমি, প্রতীক্ষাতে কখন চেয়ে দেখি
অনেক রঙে বিচিত্র তার তনু,
উচ্চারিত গানের সুরে, অনেক স্মৃতির ঢেউয়ে
আমি শুধু বিস্ময়ে রামধনু॥

মিল খুঁজি মেঘে, চন্দ্রে

খুঁজতে খুঁজতেই আহা, পেয়ে যাই মিল
ইন্দ্রনীল মেঘের মিছিলে
নিলয় সন্ধান করে ছুটন্ত হরিণ
চোখে ছিল হরিণীর মায়া
ছিল বা মারীচ, ছিল বুঝি নিথর পাহাড়
নীলকণ্ঠ চূড়া, ছিল রূপকথা নদী
খুঁজলেই মেলে বুঝি রামধনু
বিচিত্রিত বিপন্ন বিকেলে।

রক্তে তবু অনুতাপ নেই, অভিভাষণ নেই কোনো
লাবণ্যকলার
অন্য কোনো হৃদয়ের রঞ্জন ছিল না সাধ্য,
চেষ্টাও নেই
আপ্লুত সরণী থেকে সরসিজ মুখ তুলে চায়
নবীনা নারীর কণ্ঠে তখনিই ছিল সম্ভাষণ।

মল্লারে বাদল নামে শ্যামলিম বাংলার
নীপবনে আহা,
আমরা তখনও থাকি দগ্ধ, দীর্ণ মহিমায়
ভঙ্গুর প্রেমের পাত্র নিয়ে হাতে।
দুরন্ত সন্ধানী আমি, শিল্পী হতে পারি
হতে পারি অথবা প্রেমিক
মনে মনে কাপুরুষ, অহংকার ছিল তবু দেহ শেষে
তৃণে তৃণে,
পূষণেরে সম্ভাষি, তোমার সূর্য চন্দ্র
দুই যমলাগ্নি, জেনেছিল তবু
আমাদের তীব্রতা বাঁচার ভালবাসিবার।

অনাবৃত করো মুখ হে সুতীব্র,
তোমাকেই দেখি
তোমার দর্পণে ভাসে ম্রিয়মান সত্তার বৈভব।

দাও ভীষণ অহংকার, দাও প্রবলতম আকর্ষণ
ভাঙ্গি পুরাতন বেড়া, গড়ি তব নূতন বিস্ময়।
বন্য নই, শহুরে ভব্যতা দিয়ে ঢাকা
হৃদয় আমার
ভালবাসা ছিল এক কুসুমকোরকে শুভ্রতার।

ঈশানের মেঘ ভেঙে বায়ু ছোটে
ধূলি ঝড়ে অন্ধ দিবানিশি
ক্রমশ হৃদয় পোড়ে, লক্ষ্য ছিল তার
অনন্তের লাবণ্য সঞ্চার।

তখনো তোমাকে খুঁজি মরকত
নিলাজ নিখিলে, বিশুদ্ধ গোলাপে, আহা
উন্মীলিত অজস্র পাঁপড়িতে
আলোকিত মসৃণ সিঁড়িতে
ভাসমান নদী জলে প্লাবিত জ্যোৎস্নার করতলে
নিযুত আলোকবর্ষে সপ্তর্ষির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে
অপ্রমেয় সন্ধান আমার।

জানি তার বিশালতা পরিব্যাপ্ত
তোমার সুনীলে
অণুতে অণুতে তার জয়ধ্বনি
মিলায় অমিলে

তথাপি সে মিল খুঁজি অস্তিত্বের
পরতে পরতে
বনানীর রক্তিম পলাশে, অন্তরীক্ষে
স্তম্ভিত বিস্ময়ে।
খুঁজতে খুঁজতেই আহা, পেয়ে যাই ডানা
দুরন্ত বাসনা
জ্বলে ওঠে শেষবার প্রত্যাশার অসম্ভব মিলে।

বলোনা কেমন করে এলাম

বলো না, কেমন করে চলে এলাম এতদূরে
সারাদিন মনটা ছুঁই ছুঁই করছিল ওই রাত্রির জন্য
সারাদিন তালপাতার বাঁশি বাজিয়ে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে
সারাদিন দাঁতের ময়লা তোলার জন্য বসে থেকে
ঘাড় কাৎ করে এখন ঝিমুচ্ছে।

এমনি করেই এক একটা তপ্ত দিন
আমরা পার হয়ে আসি
যেন একটা উর্দ্ধশ্বাস মেলট্রেন ছুটতে ছুটতে নিজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে।
দু'পাশে অনন্ত গ্রামরাশি, নিখুঁত নীল, ঝুঁকে-পড়া বিকেল
ঘর-ফিরতি মানুষের চকিত মুখগুলি
ইঞ্জিনের হেডলাইটে ঝলসে উঠে
আবার সমস্ত অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

পথের পাশে কেয়া ফুটেছিল, তা দেখার সময় হয়নি
প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে কেউ নির্নিমেষ তাকিয়েছিল
সময় হয়নি
কোথাও আর নামা হল না, আর কোনো বিষয় না,
শুধু তোমার কাছে আজ নতনেত্র আকাশের সমারোহে
সন্ধ্যার মিনতি হয়ে এলাম।

বলো না, কেমন করে এলাম এত দূরে
তোমার দেহলিতে ঢেউয়ের গোঙানি
বালির ভেতর পা ডুবিয়ে এক ঘর-পালানো শিশুর মতো
প্রতিদিনের খেলা ভাঙার খেলা।
আমি ছুঁইনি এই ঢেউগুলি
তোমার দেহের আশেপাশে আমি বসে থাকি
বাঁধা পড়ে গেছি আমি তোমার ওই অবিরাম কেশপাশে
এখানেই সব আকুলতার সমাপ্তি।

পর্যাপ্ত ভাসান

এ সব কিছু ভাল লাগার কথা নয়
আমার চোখের সামনেই
প্রতিমার পর্যাপ্ত ভাসান

ঘটে গেল,
অবিরল জ্যোৎস্নাজল
রূপালি রাত্রির ভিতর অন্যমনে খেলা করে চলে

সবেমাত্র একটা প্রজাপতির নিঃশব্দ মৃত্যু দেখে
কবিতার মিল খুঁজতেছিলাম
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সর্বত্র
এলোপাথারি সময় লোভে, উচ্চাশায় ব্যর্থতায়
চমমন ভিতর বাহির
মিল কোথায়? কলমের ডগা নিসপিস করে
মানুষগুলিকে বেমানান মনে হয়
মুখে গুণ্ডি-দেওয়া পান, চোখে নেশা
সভ্যভব্য নেশার সঙ্গে একদম বেমানান।

এ-সব কিছু ভাল লাগার কথা নয়
আমার চোখের সামনেই
প্রতিমার পর্যাপ্ত ভাসান ঘটে গেল।

লিফটে নিচে নামছি

লিফটে নিচে নামছি, চারদিক বন্ধ আমি একা
লিফট নামছে বেড়ালের চোখের মতো আলো জেলে
লিফট নামছে, নামছে, নামছে
উজ্জ্বল সোপানগুলি পদতলে মুখরিত ছিল এতক্ষণ
সেগুলো এখনো আছে, এখনো পায়ের শব্দ
আমি আর সেগুলি দেখি না।

লিফট কোথায় নামছে, পাতালে কি?
সেখানে ভীষণ অন্ধকার
অন্ধকার বুকে নিয়ে বসে আছে সেই লোকটা

দৃশ্য দেখে দেখে স্বভাবের
অন্তর্গত সদসৎ চিন্তায়
গা গুলিয়ে উঠে
এই সব অনিবার্য করুণতা, কমনীয় বস্তু
মহৎ ট্র্যাজেডি এবং তার ক্যাথারসিস
কোনো কিছু আজকাল বরদাস্ত করি না।

একদিন এবম্বিধ দৃশ্য দেখে
পরিপূর্ণ সৌম্য বিষাদে মন লিপ্ত হতো
একদিন এই সব প্রতিমার পবিত্রতায়
ভয়ানক আকৃষ্ট হয়েছিলাম
একদিন পবিত্রতা বহুতর সাধ্যবস্তু ছিল।

বলেছিলাম, হে রমনীগণ,
তোমাদের এই মহিমা বেঁচে থাকুক
ইতরতায় যেন তা নষ্ট না হয়
কেউ যেন বলাৎকারে প্রলুব্ধ না হয়

বলেছিলাম, আমাকে প্রহরী বানিয়ে রেখে না
প্রাকৃতির প্রতিমা দেখতে খুব ভালবাসতাম তখন
বলেছিলাম, তৃষ্ণা পেলে শুধু
আঁচল ডুবিয়ে লাবণ্যের জল দিয়ো
আমি কাদা পার হয়ে
তোমাদের মালা হতে খসা ফুল
নাচাতে নাচাতে চলে যাবো।

ওরা বোধ হয় সে কথা আমলে আনেনি
খিল খিল হাস্য করে
রক্ত মাতিয়ে দিয়ে
পুরুষের উজ্জ্বলতা পাবে বলে চলে গিয়েছিল।

তখনও আমি কবিতার মিল খুঁজতেছিলাম

মসৃণ, চিকণ, মেহগিনির মতো আদিম দৃঢ়তায় বাঁধা
বাটালি দিয়ে কুঁদে কিছু সুদৃশ্য ফুলকারি

লীলাচলমের সিঁড়ির সেই তেলেঙ্গী বুড়ির
কাছ থেকে কেনা পুতুলের মতো
অনিবার্য এবং অব্যবহার্য এক গম্ভীর কবিতার।
ইতিমধ্যেই প্রজাপতির বাহারি ডানা
খসে পড়ল
প্রজ্জ্বলিত ফুলের তুঙ্গ ঘনিষ্ঠতার আশায়
নিপাত হল, বেচারা!
কতকগুলি ডাঁশ পিঁপড়ে তার সোনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে
'মার জোয়ান হেঁইয়ো'—বলে
অবিশ্রান্ত শব্দ করতে করতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল
ক্ষুধার্ত বিবরের দিকে
আমি প্রতিমার শবগুলির কথা ভাবছিলাম
জ্যোৎস্নার জলে তাদের খড়
এঁটেল মাটি বাঁশ ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয়গুলি
সব ভেসে ভেসে যাচ্ছিল
সব ভেসে ভেসে যাচ্ছিল
সব ভেসে ভেসে যাচ্ছিল

বেয়াকুফ প্রজাপতিই শুধু জানল না।

যখন বৃষ্টি শেষ হয়

যখন বৃষ্টি শেষ হয় তখন
আকাশে আর কিছু থাকে না
শুধু নীল

যখন বৃষ্টি শেষ হয় তখন
সেই আশ্রিত পাখিগুলি ডানা লুকোবার জন্য
ছাদের কার্ণিশে এসে জড়ো হয়।

যখন বৃষ্টি শেষ হয় তখন
পদ্মপালের মতো ঘরের শিশুরা পথে নামে
এই জলে শিশুরা প্রচুর খেলা করে।
যখন বৃষ্টি শেষ হয় তখন
কাজ-ফিরতি মানুষগুলি কোমরজল ভেঙে
সারাদিনের গল্প করতে করতে বাড়ি মুখো হয়

যখন বৃষ্টি শেষ হয় তখন
সোনামণির মা'র চোখে জল চিক চিক করে
পড়ন্ত রোদে দাওয়ায় না ছড়িয়ে বসে
তার কান্না সুরু হয়।

তার ঘর থেকে একটি শিশু
হঠাৎ একদিন খেলার পুতুল ফেলে
পালিয়ে গেছল
বৃষ্টির জলের শব্দে তার পায়ের শব্দ
আর শোনা যায় না।
মানুষের ঘরের দাওয়ায় মাটির ঘরের মা
তখন কাঁদতে থাকে

যখন বৃষ্টি শেষ হয় তখন।

বিষণ্ণ চেহারা যার, নির্দয় নিশ্চিত
পৃথিবীর উজ্জ্বল সোপানগুলি পদতলে মুখরিত ছিল
সেগুলো হারিয়ে গেছে
আমি আর সেগুলি দেখি না।

৪

লিফটে নিচে নামছি, চারদিক বন্ধ আমি একা
কোথায় নামছে ইহা, পাতালে কি?
সে কথা জানি না, জানবার ইচ্ছাও রাখি না
যেহেতু পৃথিবী ভাল, ঢের ভাল পাতালের চেয়ে

পৃথিবীতে সূর্য ওঠে, স্বপ্নের কুঁড়ি নিয়ে বসন্তে এখনও ফুল ফোটে।

অদ্বিতীয় ক্ষুধা

এখন সবই বন্ধ
দুপুরের মণিবন্ধে রৌদ্র চমকায়।
রাস্তায় ভিখিরি-কুকুর এবং কয়েকটি মানুষ
বারুদের গন্ধ সোঁকে বিক্ষুব্ধ হাওয়ায়।

কালকের সংলাপ
আজ আর যাবে না শোনা নিহত
দিনের শেষে শুধু ধোঁয়া শুধু অন্ধকার।

মাদারের গাছে ফুল, রক্ত লাল পশ্চিম আকাশ
ভয়ানক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে
তারি যেন পরামর্শ সকালে দুপুরে হয়
সন্ধ্যায় ভৌতিক ইচ্ছা···অবরুদ্ধ নগর দরজায়
মানুষের ক্ষুধা সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে
লম্বা চীৎকারে।
কই হে, হলো কি কিছু? ইতিউতি জিজ্ঞাসার
ফাঁকে এ্যাম্বুলেন্স যায়, দমকল ভয়ানক

আর্তনাদ করে
বালিতে রক্ত শুকোয়, আগুনের অবাধ্য জিহ্বায় স্বাদ লাগে।
মাদারের লাল ফুল বেহায়ার মতো শুধু হাসে
চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে।
কথা ছিল সব কিছু খোলা রেখে চলবে সংলাপ
দরজা ভেজানো দেখলে নানাবিধ সন্দেহেতে পায়
নিমাইয়ের লাশ কই? নুরুলের জননীর বুকে
নিশ্চিন্ত সান্ত্বনা কই?
ভাত খেতে চেয়েছিল যারা, তারা কই?
প্রশ্নের উত্তর নাই, শুধু গাছপালা
নির্বোধের মতো মাথা নাড়ে।

এই তো আজকের দৃশ্য, এই বুঝি নদী
এইখানে এক বুক জলের ভিতরে দাঁড়ায়ে দেখেছি ইছামতী;
দেখেছি চিতার চিহ্ন, পোড়াকাঠ, হাড়ের অঙ্গার ঢেউয়ে ভাসে
দেখেছি সবই···দুইতীরে মানুষের ভীড়
এখনি কান্নার পাঁচিল দীর্ণ হয়ে বেরোবে আগুন।

যেতে যেতে ইতিহাস পাক খায় চৈত্রের হাওয়ায়
আকন্দ ফুলের গন্ধে আকুলিত কেশ,
ছিন্ন বেশভূষা···ধুলোয় লুটানো ভালবাসা।
জন্তুর হিংস্র দাঁতে ছিঁড়েখুড়ে গিয়েছিল আশা।
বুকে ভর দিয়ে হাঁটে···সামনে দুস্তর অমানিশা।

এসো হে আমরা এগোই, দেরি কেন?
কেন থমকে যাওয়া? সবাই থমকে গেলে,
হবে না আজ কিছুই পাওয়া

এইভাবে ক্রোধ বাড়ে আগুনের উত্তাপ ভীষণ
হাত দিতে আঁচ লাগে, তা লাগুক, তবু
ক্ষুধার সঙ্গে কোনো চাতুর্যের কথা নেই।
ক্ষুধা অদ্বিতীয়।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা

পরিমল চক্রবর্তী

নিখিল কাব্যসংসারে আমরা দু'ধরণের মানুষের সাক্ষাৎ পাই। এক ধরণের মানুষ আছেন যাঁরা কবিতা লেখেন এবং শুধুমাত্র কবিতাই লেখেন, দেশে দেশে, যুগে যুগে, এই ধরণের মানুষদের কথা আমরা শুনেছি, তাঁদের রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি বিশুদ্ধ কবিতাপাঠের আন্তরিক প্রেরণায়। এঁরা সম্পূর্ণতই কবি, অর্থাৎ কবিতা রচনা এবং কবিতার ভাবনাতেই এঁদের প্রতিভার স্ফুরণ, বিকাশ ও ক্রমপরিণতি। ইংরেজী সাহিত্যে এই ধরণের সার্থক উদাহরণ উইলিয়ম ওয়র্ডস্বার্থ, রবার্ট ব্রাউনিঙ ইত্যাদি, আমাদের সাহিত্যে অরুণ মিত্র, সমর সেন এবং আরো কেউ কেউ।

কিন্তু আরেক ধরণের মানুষ আছেন যারা প্রধানত কবি হলেও সম্পূর্ণত কবি নন, এঁরা কবিতার জগতে যেমন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন, ঠিক তেমনি প্রবন্ধের জগতেও তাঁরা স্বাধীন নাগরিক। হৃদয় নির্ভর, আবেগসঞ্চারী অসংখ্য কবিতা রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত বিরল-কর্মী অধ্যুষিত, পরিশ্রম সাপেক্ষ ও দুরূহ দিকটির প্রতিও তাঁরা তাঁদের উদার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন, বিস্তৃত কবিজীবনের ফাঁকে ফাঁকে এদের লেখনী অবিরল প্রবন্ধমালাও উচ্ছিত হয়ে উঠেছে। কবিতা রচনার হ্লাদিনী লীলার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ সৃষ্টির গুরুদায়িত্বও যে এঁরা গ্রহণ করেছেন, এজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আছি। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য এই শেষোক্ত মানুষদের তালিকার পুরোভাগে রয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীর নাম। এই শেষোক্ত মানুষদের তালিকাতেই আমি আরো একটি নাম যোগ করতে করতে চাই এবং সে নাম কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের।

প্রবন্ধকার কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নন। সেই কারণে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ওপর বর্তমান প্রবন্ধের পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টিকে আমি নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করবো। আমার ধারণা, এর ফলে, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতাকে ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

আজ থেকে অনেকদিন আগে, উনিশ শ আটত্রিশ সালের ডিসেম্বর মাসে,

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা' প্রকাশিত হয়েছিলো। বাংলা সাহিত্যের আসরে কিরণশঙ্করের সেই প্রথম সোচ্চার আবির্ভাবের কথা আমাদের মধ্যে আজ যাঁরা প্রধান সাহিত্যিক, তাঁদের কারো কারো, আশা করি, মনে আছে। কবিজীবনের সূচনাপর্ব থেকে শুরু করে উনিশ শ' আটত্রিশ সাল পর্যন্ত রচিত এবং তদানীন্তন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার সুগ্রথিত সংকলন 'স্বপ্ন-কামনা'-র সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা 'হে ললিতা ফেরাও নয়ন!' এই কবিতার প্রথম স্তবক, আমার বিবেচনায়, কিরণশঙ্করের সামগ্রীক রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ। আমার বক্তব্যের সমর্থনে স্তবকটির উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না হয়তো:

হে ললিতা ফেরাও নয়ন!
যদি শুভ্র শ্রীদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন
মুক্তিস্নান এনেছে জীবনে,
দূরে যাক লোক-পরিবাদ।

এই স্তবকটি এককালে তরুণ কবিদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো এবং সমালোচকদের কেউ কেউ, শোনা গেছে, এই স্তবকটিতে কেন্দ্র করেই কিরণশঙ্করের রচনার ওপর ডি, এইচ, লরেন্স-এর কাব্যদর্শনের সুদূর ও অস্পষ্ট ছায়াকে একদিন খুঁজে বেরিয়েছেন। কিন্তু, আমাদের সৌভাগ্য, তেমন কোনো ছায়াকেই তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেন নি, এবং সত্যিকার অর্থে কোনো দেশের কোনো কবির ওপরই কোনো দেশের কোনো কবির প্রভাব ঠিক এইভাবে খুঁজে বের করা যায় না কিংবা তা প্রমাণ করবার জন্য যতো শ্রমই করা যাক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত পণ্ড হতে বাধ্য।

'স্বপ্ন-কামনা' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতাটি সম্পর্কেও একই কথা বলতে পারলে আনন্দিত হতাম, কিন্তু বারবার কবিতাটি পাঠ করেও তেমন কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত। তবে এই কবিতাটি সম্পর্কে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে সমগ্র কবিতাটির শ্লথমন্থর গতি কবিতাটির সপ্তম স্তবকে আবেগের উচ্চ চূড়াকে, স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে যদিও পাঠক-পাঠিকাকে বিহ্বল করার ব্যাপারে 'স্বপ্ন-কামনা'কে কোনোমতেই 'হে ললিতা ফেরাও

নয়ন!' এর সঙ্গে তুলনা করা চলবে না। 'স্বপ্ন-কামনা'র সপ্তম স্তবকে কবি যখন তাঁর প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেছেন :

ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে
যদি কভু হই একজন,
মালা হাতে মুক্ত স্বয়ম্বরে
স্মিত হেসে আরক্ত অধরে
চিনতে কি পারবে তখন?

তখন আমরা, যারা কবিতাকে ভালোবাসি এবং ভালো কবিতা রচনাকে সার্থক জীবনযাপনের একটি (না, একমাত্র?) প্রক্রিয়া বলে মেনে নিয়েছি, তাঁরা আমাদের জীবনের চিরন্তন একটি প্রশ্নকেই যেন এই ছত্র কতিপয়ে খুঁজে পাই! এই ভাবে নিজেকে সকলের মধ্যে সম্প্রসারিত করা কিংবা সকলকে নিজের মধ্যে প্রতিভাত করা শক্তিশালী কবির লক্ষণ, সন্দেহ নেই। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর একাধিক কবিতার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে শক্তিশালী কবির লক্ষণ তাঁর রচনায় বিদ্যমান।

উনিশ শ' তিপান্ন সালের আগষ্ট মাসে কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' প্রকাশিত হবার পর থেকেই তিনি সমকালীন বাঙালি কবিদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে চিহ্নিত হলেন, অথচ আশ্চর্যের তো বটেই, এমন কি পরিতাপের বিষয় যে আজ পর্যন্ত কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিকৃতির ওপর এমন কোন যোগ্য আলোচনা করার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করলেন না যা কিরণশঙ্করের কবিতার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে। পাছে কেউ বিতর্ক তোলেন সে জন্য এখানে জানিয়ে রাখি যে কিরণশঙ্করের কবিতার ওপর আলোচনা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। আজ পর্যন্ত মাত্র দু'টি রচনা আমার নজরে পড়েছে এই সম্পর্কে। কিন্তু একটি রচনাও আমাকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। প্রথম রচনাটির লেখককে কোনোক্রমেই কবিতার জগতের অধিবাসী বলা চলে না। ফলে, তাঁর কাছ থেকে কোনো কবির কবিতার 'আঁতের খবর' জানবার প্রত্যাশাই আমরা করতে পারি না। দ্বিতীয় রচনাটির রচয়িতা নিজে কবিতা লেখেন, কিন্তু কিরণশঙ্করের কবিতাকে বিচার করতে গিয়ে তিনি নির্ভুল মানদণ্ড ব্যবহার করতে পারেন নি বলেই আমার ধারণা। এই সব কারণে বর্তমান প্রবন্ধকে কিরণ-

শঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা বোঝা ও বোঝানোর ব্যাপারে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসেবে কিরণশঙ্করের অনুরাগীরা কোনোদিন চিহ্নিত করবেন, আশা করি।

উনিশ শ' চল্লিশ সালে রচিত কিরণশঙ্করের 'স্বর' কবিতাটির ওপর পাতার পর পাতা অনায়াসেই লেখা যেতে পারে, সেটা ভাষ্যই হোক, টীকাই হোক বিশ্লেষণই হোক! কবিতাটি সদর্থে এতোই আদিম! 'স্বর' কবিতাটিকে আমি সেই শ্রেণীর কবিতার অন্তর্গত করতে চাই যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'ambitious poem'। কবিতাটির নাটকীয় সংলাপরীতি, বিশেষ কয়েকটি পংক্তির আবর্ত পদ্ধতিতে ব্যবহার, নিখিল-মানব-সংসারব্যাপ্ত পটভূমি—এইসব কিছু মিলে কবিতাটিতে এমন একটা শক্তির সঞ্চার হয়েছে, যা একথা অনায়াসেই বলা চলে, যে কোনো কবির যে কোন রচনাতেই সহজে পাওয়া যায় না।
উদাহরণ :

তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা!

অথবা—

কামনা-পীড়িত চোখ ম্লান ঠোঁটে উপবাসী হাসি।
আয়ো কাছে ঘেঁসে বসে মেদনম্র মেয়েটির কাছে;
বলে হেসে : 'যাবে সিনেমায়?'

যে নায়কের চোখ কামনা-পীড়িত, ম্লান ঠোঁটে উপবাসী হাসি যার সম্বল, তেমন নায়ক সিনেমার সঙ্গিনী হিসেবে যে মেয়েটিকে পেতে চায়, সেই মেয়েটির সম্পর্কে কবি 'মেদনম্র' বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন কী রকম অনায়াসে, সেটাই লক্ষ্যণীয়।

কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'দিনযাপন'। প্রকাশকাল জুলাই, উনিশ শ' বাষট্টি। কবিতার সংখ্যা ছেষট্টি। 'দিনযাপন' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত ছেষট্টিটি কবিতা থেকে মাত্র একটি কবিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলে বর্তমান আলোচনা আমি শেষ করবো। সেই কবিতাটির নাম 'দিনযাপন', 'দিনযাপন' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। কবিতাটি পড়তে পড়তে হয়তো বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত্ত' কবিতাটির কথা মনে পড়তে পারে, তবু কিরণশঙ্করের কাব্য-প্রতিভার বিবর্তনের ধারাটি অনুধাবনের পক্ষে এই কবিতাটি মূল্যবান। এই কবিতার কেন্দ্রে আমরা এমন একজন আধুনিক মানুষকে খুঁজে পাই যে তার

স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় বিচলিত এবং সমস্ত কবিতাটিতেই মানবিক দশা বা 'the human situation' সম্পর্কে কবির প্রাজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যখন তিনি বলেন :

পশ্চিমেও ইউরোপে ঢের
জোট, দল, আন্দোলন ; দ্রুততাল প্রচারের ফলে
দুর্গম অরণ্যে দ্বীপে রজনীর অন্ধকারে চুপে
কোরিয়ায় তাইয়ানে ইন্দোচীনে মালয়-জঙ্গলে
ষড়যন্ত্র চলে রোজ ;

তখন একজন আধুনিক মানুষের রাজনৈতিক ও আদর্শগত স্বপ্নভঙ্গের বেদনা যে কতোখানি বিষাদাস্ত হ'তে পারে, সেই কথাই আমাদের মনে আন্দোলিত হ'তে থাকে বার বার। এতোদিন ধরে কিরণশঙ্কর যে সহজ সরল রোমান্টিকতার লঘুপক্ষে আশ্রয় করে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, এই কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিজীবনের সেই পর্বের অবসান হয়ে নতুন পর্বের সূচনা হয়েছে। এবং এর সঙ্গে আরো কোনো কোনো কারণ যুক্ত হওয়ায় 'দিনযাপন' নামক কবিতাটিকে আমি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর সামগ্রীক কবিতাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিণত কবিতা বলে মনে করি।

এবারে আমি সনেটকার কিরণশঙ্কর সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, না হলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকবে। বাংলা ভাষায় এতোদিন পর্যন্ত সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা কিছু কম লেখা হয়নি ; এখনো যা লেখা হচ্ছে তাও পরিমাণে সামান্য নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব কম সংখ্যক কবিই সনেট রচনায় সফল হয়েছেন। বহিরঙ্গ অনেকেরই নিখুঁত, কিন্তু সেই নিটোল গাঢ়তা যা নাকি সনেটের আত্মা, তা অনেকের সনেটেই অনুপস্থিত। বিরল সংখ্যক যে কয়জন কবি সনেট রচনায় সফল হয়েছেন, কিরণশঙ্কর তাঁদের অন্যতম, যদিও আমার ভয় হয়, সনেটকার হিসেবে কিরণশঙ্কর আদৌ গণ্য হবেন কিনা ভবিষ্যতে, কারণ অতি সাম্প্রতিককালে বাংলা সনেট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এতোই দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আয়ুর মধ্যাহ্নে পৌঁচেছেন ; কিন্তু সৃষ্টির অজস্রতায় এখনো তিনি তরুণদের ঈর্ষাভাজন। এবং একজন কবি সত্যি সত্যিই বেঁচে আছেন, এটাই হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কবিতাবলী

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

চড়াই

তোমার নির্জন দ্বীপ, তুমি জানো রহস্যে গভীর।
আমাকে চাও না তুমি, তাই হোক, আমি তো অবাক
দেহের নদীর জলে ডুব দিয়ে তরঙ্গে অস্থির;
সময় ফিরিয়ে নিতে দিয়ে যাই ডাক।

ভালবাসা? তা-ও নয়। অন্ধ চোখ দ্বীপের সবুজ
ভুলে গেছে। চড়াই-পাখির জোড়া বড়ই অবুঝ:
দ্বীপময় ছোটাছুটি, খুঁটে খুঁটে চাল বা কলাই
নিয়ে যায়। ভালবাসা? এরপর ভাল না বলা-ই।

আমাদের চারধারে হাত-পাতা দিনের আলোক
আনমনে তুলে নেয় কালকের হারানো পালক।
চড়াই চড়াই ওগো, তোমাদের কে রাখে ঠিকানা
নির্জন দ্বীপের মাঝে? আমি একা। সেকথা জানি না!

তোমার রহস্যে আজ, আমি জানি, দ্বীপের নদীর
অস্থির জলের স্রোত। তাই হোক্। অনেক গভীর।
তোমার দেহের তীরে নির্জনতা করেছে গভীর।
ভালবাসা? তা-ও নয়। তুমি আমি কী এক বিস্ময়!

সেই ঠিকানা

কোথায় পাব নাম-ঠিকানা, পাঠাব যে!
দিন-রাত্তির সবাই খোঁজে
অন্ধকারে আলোর ধারে
দৃষ্টিটুকু আড়াল ক'রে অঙ্কুরেরা মাটির কাছে।

নাই ঠিকানা—তবুও চোখে প্রশ্ন নাচে,
খোঁজার পালা শেষ হবে না—সবাই বোঝে।

সবাই বোঝে? জানি না ঠিক, কেউ কী জানে?
অস্থিরতার নিপুণ টানে
চোখের কোণে প্রহর গোণে
উর্ণনাভে বন্দী মাছি অসংগত প্রতীক্ষাতে
ঠিক-ঠিকানা হারিয়ে গেছে হৃদয় জোড়া রিক্ততাতে।
মাটির তলে দু'হাত ভরে পাঠাব যে,
—কিসের খোঁজে?

কী তার নাম, কোন্ ঠিকানা—কোথায় পাব?
হে ঈশ্বর, নিরুত্তর!
অহঙ্কারী অন্ধকারে এমনি তবে হারিয়ে যাব!

অনন্ত বিশ্বাস

সূর্যের অনেক ইচ্ছা বায়ুস্তরে রিক্ত হয়ে যায়,
আমরা যেটুকু পাই ঠাণ্ডাঘরে বহুদিন মৃত:
কফিনে নিবিড় রাত্রি; অভিশপ্ত সময়ের বুকে
ভুলের মাশুল গোনা, মৃত মুখ খুঁজে খুঁজে
স্মৃতির তালিকা নিয়ে অন্ধকারে নাম ধ'রে ডাকা।

ঈশ্বর, আমার স্বপ্ন অস্থির আলোয় পলাতক—
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শবযাত্রা, ইচ্ছার কবর।
বিশ্বাস আমার তবু অনির্বাণ দিনের চিতায়
রাতের নক্ষত্রে সূর্য তার ইচ্ছা রেখেছে নিহিত:
সে-ইচ্ছা অগ্নির মত জ্যোতির্ময় আমাদের মনে
উজ্জীবিত হবে ঠিক, বায়ুস্তর হৃদয় স্পন্দন
সূর্যের বুকের কাছে নিয়ে যাবে পরম বিশ্বাসে।

তিন কাল

সমস্ত সমুদ্রে দেখ, অন্ধকার, ছুটে আসে তরঙ্গের মত—
মাথা-ঝোঁকা আকাশের চুলে মেঘ জমাট পাথর:
সময় দর্শক শুধু। সুনিপুণ ভাস্করের হাত
অনেক পাথর কুঁদে, অনেক অতীত থেকে অন্ধকার নিয়ে
নীরব মৃত্যুর শীতে সাজিয়েছে এই যাদুঘর।

আমরা এখনো আছি শিল্পীর তুলিতে আঁকা পটভূমিকায়
দিগন্তে আকাশ হয়ে, কিংবা কোনো কুয়াশার
স্নিগ্ধ-করা পাহাড়ে অরণ্য হয়ে;
আমাদের ঝরে-পড়া পাতাগুলো ভেসে যায় ঝর্ণার জলে
নদী থেকে সমুদ্রের অন্ধকারে;
সাগর-সৈকতে বর্তমান পদচিহ্ন জীবন্ত কাহিনী।

কেন না, মৃত্যুর পূর্বে বর্তমান কথা বলে,
প্রাণ নিয়ে বাঁচার তাগিদে সাগরের মত ছুটে আসে
অন্ধকার নিয়ে। ভাস্করের হাত কাজ করে—
অনেক পাথর, অনেক সময় নিয়ে আজ যাদুঘর।

ভবিষ্যৎ অন্ধকার—বর্তমান, অতীতের মত।

দ্বিতীয় জীবন

ভাল আছ? এক কথা নীল খামে ছোট চিঠি বারবার আনে,
ওপরে অনেক নীরবতা;
ঘরের দরজা খোলা, জানালায় পর্দার ছবিতে,
আগামী দিনের কথা লেখা যেন উঁচুনীচু সিঁড়ির ছায়ায়।

তৃতীয় নয়ন নেই। দুর্নিবার আকর্ষণ
নীল খামে, শীতের পড়ন্ত রোদে;
সাপের খোলসে কাঁপে দিনের সুদীর্ঘ নীল ছায়া:
শীতলতা—ভাল থাকা—অন্য নীরবতা!

ছোট চিঠি! অতঃপর অন্ধকার
সিঁড়ি ঘর দরজা জানলা—
রাত্রির অধরে ফেনা,
মাটির প্রদীপে আলো বিশ্বাসের ধোঁয়া
দ্বিতীয় জীবন ঘিরে উদ্যত চাবুক!

আমার বিস্ময়ে

আমার বিস্ময়ে তুমি একচক্ষু শঙ্খচিল,
দিনের বিলাসে সূর্য, রাত্রির নির্লজ্জ চাঁদ;
বাতাসের অসার শূন্যতা
আমার বিস্ময়ে: পৃথিবীর অন্ধকার দুই হাতে নিয়ে গেলে

ভিজে মাটি ঘ্রাণ নিয়ে আসে,
হাতের নখরে প্রাণ—
করতলে অগণ্য জোনাকি।

শঙ্খচিল, তুমি আজ অন্তের আকাশ,
দিনরাত্রি দূরের বাতাস
আমার বিস্ময়ে।

সফল ফসল

আমার সমস্ত দিন দুই হাতে ছায়া নিয়ে কাটে
অথচ রাত্রির চাঁদ আলো হয়, ছায়া হয়, আর

অমোঘ ওষুধ আনে তিক্ত অনিদ্রার;
সমস্ত ফসল নিয়ে জড়ো করে দিনান্তের মাঠে
আলো আর অন্ধকার যাযাবর হাটে।

কোথায় সফল দিন? অনাবৃষ্টি মতলব আঁটে:
আলো আর অন্ধকারে
যাযাবর দিনরাত কাটে।

হে অরণ্য

তুমি তার পথ ছেড়ে দিলে। চলে গেল শীতের বাতাসে ঝরাপাতা,
তোমার শাখায় তার সুভাষিত কথার প্রলেপ:
শকুন্তলা তুমি তার নাম রেখেছিল।
(আর কোনো নাম, হে অরণ্য, মনে পড়ে নি কী?)

সকালে নির্বোধ ছায়া পথে পথে জড়াজড়ি করে। ঝরাপাতা
জড়ানো তাদের মনে। সূচী-তীব্র শীতবেলা অস্থির গহ্বরে অন্ধকার
ভালবাসা জালে। পদধ্বনি ক্ষীণতর।
শকুন্তলা কেন তুমি নাম রেখেছিল!
(আর কোনো নাম, হে অরণ্য, মনে পড়ে নি কী?)

আজ তুমি পথ ছেড়ে দিলে। চলে গেল রাতের ছায়াতে ঝরাপাতা।
শাখায় শাখায় রোদ হেসে গেল উজ্জীবিত দিন,
শকুন্তলা তুমি তার নাম রেখেছিলে।
(আর কোনো নাম, হে অরণ্য, মনে পড়ে নি কী?)

অকাল মৃত্যুর ভিড়ে

অনেক অকাল মৃত্যু পদ্মবনে ভিড় করে;
সময় জলের মত টলটল
পদ্মপাতার শরীরে।

আমি ঝ'রে যেতে জানি, পদ্মফুল,
আমি ঝ'রে যেতে পারি। পদ্মপাতা,

তোমার শরীরে কোন চিহ্ন না রেখেও
আমি ঝ'রে যেতে পারি।

তবু এক সূর্য র'য়ে যাবে
তুমি আমি ঝ'রে যদি যাই
অকাল মৃত্যুর ভিড়ে
পদ্মবনে
সময়ের মত
টলটল
জলে।

যে-কোনো সময়

যে-কোনো সময়
রোদের আড়ালে ছায়াময় পথ
নির্বাক থাকে—নির্বাক,
কত তন্ময়—
ছায়ার মিছিলে ঘুরপাক
আর ঘুরপাক।
নির্জন পথে সংশয়
আনে প্রাজ্ঞ দিনের দাঁড়কাক।
যে-কোনো সময়
পথে ঘুরে ফিরে নির্বাক থাকি—নির্বাক !

যে-কোনো সময়
সবুজ শিশিরে কিশলয়
দোলে উন্মন, দোলে উন্মন :

কত বাঙ্ময়
দিন নির্জন রোদে নির্ভয়
আর নির্দয়।
নির্জন পথে সংশয়
আনে প্রাজ্ঞ দিনের দাঁড়কাক ;
যে কোনো সময়
পথে ঘুরে ফিরে নির্বাক থাকি—নির্বাক।

বিস্মৃতি নিয়ে

আকাশের রঙ মেখে মা তার ছেলেকে ডাকে
অন্ধকারে নীলকণ্ঠ পাখির মতন :
'খোকা—খোকা—কোথা তুই, কোথায়, কোথায় ?'
রজনীগন্ধার মত অন্ধকারে মায়ের শরীর যেন
জোনাকির আলো। হারানো ছায়ার মতো স্বর।
মাকে আমি কখনো দেখি নি :
আকাশে তারার ভিড়ে মা-কে আমি চাঁদের মতন
সুনীলবসনা মুগ্ধা রাত্রি বলে জানি।

মা আমায় অনেক ডেকেছে,
আমি মা-কে কখনো দেখিনি।
আমার মায়ের ছায়া চাঁদের ছায়ার মত
শুধু উড়ে যায়…
সাগরে, পাহাড়ে, বনে, আকাশের গায়।
মাকে আমি কখনো দেখি নি,
মা আমায় ডেকেই চলেছে :
'খোকন, মানিক, সোনা—কোথায়, কোথায় ?—
আমার দু'চোখ অন্ধ যন্ত্রণার সুউচ্চ মিনারে,
আমার দু'চোখ অন্ধ পৃথিবীর সুতীব্র আঁধারে,

আমার দু'চোখ অন্ধ : দু'চোখে কেবলই ভয় ভয়,
'তোর তো দু'চোখে ঘুম : আয় খোকা, ফিরে আয়।'

অন্ধকার স্বর নিয়ে নেমে আসে নীলকণ্ঠ পাখি
রজনীগন্ধার মত আকাশের নীল বুক চিরে
বিদ্যুতের আর্তনাদে
আমার মায়ের মত :
অন্ধকার শুধু অন্ধকার।

পুতুল

পুতুল-খেলা বন্ধ হ'লে পুতুলগুলো কোথায় রাখি,
কোথায় রাখি মুখোস-পরা ভাবনাগুলো?
সাজ-পোশাকে সুসজ্জিত বিড়ম্বনা
ঝুলিয়ে রাখি একটি ক'রে আলনাটিতে।
পুতুলগুলো কোথায় রাখি চোখের পাতা হলদে হ'লে?

সুযোগ বুঝে বৃষ্টিধারা দিগ্‌বিদিকে অন্তর্বরা—
কোথায় রাখি ঘরকন্নার লক্ষ ছবি?
সানাই-বাঁশি বাজিয়ে আসে অস্থিরতা,
আদর ক'রে সাজিয়ে রাখি কুলুঙ্গিতে :
পুতুলগুলো কোথায় রাখি শানাই-বাঁশি বন্ধ হলে?

পুতুল-খেলা বন্ধ হ'লে পুতুলগুলো হারিয়ে যাবে,
হারাই জানি এমনিতর ভাবনাগুলো।
মুখোস-পরা ঘরকন্নার অন্তরালে
সাজাই তবু চোখের পাতা কাজল-কালো,
হাত-পা-ভাঙা পুতুলগুলো ঝুলিয়ে রাখি আলনাটিতে।

ফিতে বাঁধা দিন

লাল ফিতে দিয়ে দিনগুলি বেঁধে অন্ধকারে
ডুব দিয়ে যাই। কথা ছিল তার মুক্তোমালা
পথের দু'ধারে বটের মতন গরিষ্ঠতা
দু'হাত ছড়িয়ে পতাকা ওড়াবে নিরঙ্কুশ।

বার বার খোলা, বার বার বাঁধা— আর্তনাদে
ফিতে-বাঁধা দিন মুখ ঢেকে কাঁপে দুঃসময়
হয়তো বা হবে; তবু তো আমার অন্ধকারে
ডুব দিয়ে দিয়ে ঝিনুক কুড়োনো, অস্থিরতা
বুকে নিয়ে হাঁটা সারা দিনরাত। অনিশ্চয়ে
দিনগুলি বাঁধি, আকাশে জালাই মুক্তোমালা
যদিও পতাকা পাখা মেলে দেয় অন্ধকারে।

চিঠি লেখা হয়নি এখনো

তোমার আসার কথা ছিল এরই মাঝে একদিন,
তাইতো কাগজ নিয়ে বসে তোমাকে এঁকেছি—
চিঠি লেখা হয়নি এখনো :
শব্দেরা অনেক দূর, নিবের ডগায় তারা সহজে আসে না।

হেমন্ত-সকাল এল ব্যক্তিগত দরবার নিয়ে,
কাগজে তোমার ছবি সে-সকাল তুলে নিল
তোমার কপাল-জোড়া ভ্রূরেখার দুই তীর ঘিরে।
তুমি এলে সেই ছবি নিয়ে যাব
পশ্চিমে পাহাড়ী দেশে, যেখানে এখনো ছবি
পুতুলের মত কথা বলে।

কাগজে অনেক ছবি, অনেক কালির ঢেউ—
শব্দের তরঙ্গে তুমি বহুদূর প্রবাসিনী :
তোমার আসার কথা এরই মাঝে ছিল একদিন।
হেমন্তের দিন জুড়ে ফসল গুণেছি শুধু,
চিঠি লেখা হয়নি এখনো।

নির্জনতা হাতে নিয়ে চলি

অন্তর্গত অন্ধকার। তবুও রাত্রির প্রথামত স্বীকারোক্তি
আমাদের জনপ্রিয় করে।
একতন্ত্র আমরা চাইনি—এই কথা বার বার ব'লে
জামিনে খালাস আছি। কত আততায়ী
শব্দময় শূন্যতায় অহঙ্কারী তীক্ষ্ম নাগরিক।

আন্তর্গত্য আপেক্ষিক। ভারসাম্য। এদিক ওদিক হ'লে
আইনের ধারা বদলায়।
নক্ষত্রের নীরবতা আমাদের অপরাধী করে,
আমরা শব্দের যত অন্ধকারে ছায়া ফেলে
অহঙ্কারী নির্জনতা হাতে নিয়ে চলি।

সিঁড়ি

সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যায়। পদশব্দে অন্ধকার
সিঁড়ির তলায় ভিড় করে।
আমি উঠে যেতে পারি, কেন না হাজার সূর্যের রঙ
তোমার নক্ষত্র-চোখে,
তোমার চোখের প্রশ্ন হাজার নক্ষত্রে ঢেউ।
নক্ষত্রের জল আমি সোনার কলসী ভরে
এনে দিতে পারি।

পদক্ষেপে স্বাভাবিক ভয়।
পদশব্দ সামগ্রিক চেতনার তন্তুজালে
শূন্যতার মাকড়সার মত
অন্ধকার বুনে চলে। তোমার চোখের পাতা
কাজলের আলপনা আমার তন্ময় মনে
এঁকে যায়;
নক্ষত্রের অসীম উষ্ণতা
ছায়া ফেলে।
পদক্ষেপে ভয়
ভয়
ভয়
শূন্যতায় মাকড়শার জালে

এই সিঁড়ি বেয়ে আমি উঠে যেতে পারি
অনেক ভয়ের উর্ধে
অরণ্যের গভীরতা সহজে ছাড়িয়ে
শিক্ষিত আশার মত।
নীচের সমুদ্র অন্ধকার :
অহঙ্কারী শৈশবের কথা আমি ভুলে যেতে পারি
স্ফটিক শিশিরে ভিজে।
ছুটির অনেক রঙ
সূর্যের শৈশবে আনে অকৃপণ দিন।
ছদ্মবেশী সময়ের অবুঝ নির্জন দ্বীপে
পলাশের লাল রঙ
সৈকতে ছড়ানো,
তোমার আঁচলে মুক্ত উচ্ছৃঙ্খল ঝড়ো পাতা
শৈশবের অবাধ্য বাতাসে।
ছুটির সমস্ত রঙ লাল—
লাল

লাল
সাগরে পাহাড়ে পথে ইতস্ততঃ অঢেল ছড়ানো।

সিঁড়ির সোপান বেয়ে চলে যেতে পারি যাযাবরী হাসি নিয়ে
আকাশে লণ্ঠন জেলে তুমি যদি থাক
স্বাতি-তারা।
মুখোসের অন্তরালে
নীলকণ্ঠ সময়ের কলঙ্ক পশরা
লণ্ঠনের আলো-আঁধারিতে তুলে নিয়ে যাব।
তুমি যদি থাক—
এই সিঁড়ি বেয়ে আমি সমস্ত নক্ষত্রে আলো জেলে দিতে পারি
অন্ধকার আপেক্ষিক,
যদিও আলোর ইচ্ছা সভ্যতর সমাজ-জীবন।

ইপ্সিত দিনের কণ্ঠে অনিচ্ছুক সময়ের প্রতিবাদ
স্বগত উক্তির মত নাটক-বিমুখ।
আমি জানি তাই প্রভাত-কাকলী
সহিষ্ণু মৃত্যুর মত
কর-রেখা নিয়ে খেলা করে।
স্বেচ্ছাচারী শব্দাবলী প্রসারিত শাখায় শাখায়
অরণ্যের অট্টহাসি আনে।
শৈশবের রঙ ঝরে,
আকাশ-প্রদীপ নিয়ে স্বাতি-তারা
কপালে সিঁদুর মাখো
চাঁদের কপালে টিপ
যদিও···
যদিও সঠিক জানো
অস্ফুট অধরে মৃত্যু সন্ধ্যামণি ফুল।

অনেক দেখেছি আমি—অনেক পৃথিবী।
গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্তের মরশুমি ফুলে
আকাশে জোনাকি জ্বলে
বহুদিন—বহুবার
দেখেছি তোমার মুখ
স্বাতি-তারা
অকারণ মুগ্ধ বোধে।
জীবনের সমস্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছি
অনভ্যস্ত সততায়
তনু মন-চেতনার অলস বিদ্রোহে।

নাগরিক আমি জানি বন্ধ্যা সভ্যতার
অশালীন সময়ের অনেক হৃদ্যতা
অনিচ্ছায় সহ্য করে যাই।
নীরবতা—দেয়ালের মত নয়।
বিবেকের অহিংস হরতাল।
দুহাত বাড়িয়ে আমি মানুষের স্পর্শ নিতে গেছি
ঘ্রাণ
রঙ
আলো—
প্রতিবার ব্যাহত হয়েছে রিক্ততায়,
চোখের দু'তীর ঘিরে কুয়াশার সিঁড়ি
পায়ে পায়ে অগ্রসর হই
এক পা
দুই পা
আকাশের বুকে পাতা সিঁড়ি বেয়ে।
সিঁড়ি
সিঁড়ি
আর সিঁড়ি।

কত সিঁড়ি।
এই সিঁড়ি বেয়ে আমি উঠে যেতে পারি
স্বাতি-তারা
তোমার চোখের জলে সমস্ত নক্ষত্র যদি জলে পুড়ে যায়।

মৃত্যুর অনেক ইচ্ছা শরীরের ভাঁজে ভাঁজে
সিঁড়ির মতন।
তারও উর্ধে চলে যেতে পারি এই সিঁড়ি বেয়ে
যদি তুমি বল, যদি তুমি—
স্বাতি-তারা!

কবিতাবলী

সত্য গুহ

এ যেন বারবেলা

পূর্ণিমা সাইক্লোন হোলো সারারাত
সারারাত তীরের মতন বৃষ্টি-নখাঘাত-হাওয়া
বাণিজ্যের বান্দাঘাটে সর্বোচ্চমাস্তলওয়ালা পণ্য জাহাজের
ঘাসে বাঁধা দড়ি;
পতাকায় বিঘোষিত এক মানুষ উঁচু স্বাধীনতা

রক্তেই বিষাদ ধরে গেছে। বর্ণ বিলাপের চিহ্ন শেষতম রজনীর
হৃদয়ে মেধায়, আর, কান্না অথবা গান
ধু-ধু করে বিপুল সুদূর।
আমি নিরবচ্ছিন্ন এক গান গহন গম্ভীর বেগে বহমান মহিলার পাশে
দূরে—যেখানে জীবন এক আলাদা অস্তিত্ব আর মৃত্যু—অন্ধকার
ভরে গেছে জোনাকীতে ধরে গেছে নির্জনতা; আবিষ্কার করেছি নিজেকে
পুরোহিত। আমি
ভালোবাসবার সব কুশলী সংগম
ঈশ্বরের শিলালিঙ্গে সপেছি প্রণামী; আর নারী
দেহ দিয়ে—বোধ দিয়ে রক্ত মাংসময় এক শান্তি দিতে চেয়ে
দিলো না। কে জানে
আমি কি রকম সুখে আছি!
কে-ই-বা কি সুখ পায় বেঁচে!!

মনে হলো, আর্ত পাখী ডাকে। বুকের চটকা ভাঙে জ্যোৎস্নার কাক-এ;
চাকুর মতন আলো রূঢ়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ঘর-গেরস্থালি জেগে ওঠে
জাহাজের আর্ত আওয়াজে;

বিরাট বাণিজ্য বায়ু, তোলপাড় বনস্থান—ওঁ ওঁ স্বর
অনিশ্চিত পরিণাম, অনিশ্চিত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ প্রেম ও সত্য ;
বিমুগ্ধতা খুন
করতল মেলে ধরে প্রত্যেকে যুদ্ধের ফল জেনে দিশাহারা ;
অথচ প্রস্তুত জন জানে ও মাথায় করে রাখে
গাছের নিকট গাছ সবুজ সূত্রে গাঁথা,
সেতারের সব তারে একই সুর বাঁধা
অনন্ত নক্ষত্র আছে আলোক সূত্রে অতি আপন এবং
মধুবাতা ঋতায়তে; সিন্ধু মধুময়
বনরাজিনীলা মাটি পুষ্পগন্ধ বিনিয়োগে খুবই টেনেছে
তাই আসা হলো, জলে বাধন খুলেছে
আত্মহারা অলীক সারেঙ্ ; আর, সবই প্রতিমুহূর্তের দূর
যার হাতে হাত রাখা, তারই হাতে লোহার দস্তানা ;
যাকে জীবনের কথা বলা, সে-ই আলেয়া। তবু
বেপরোয়া বিপুল প্রকাশে ওঠে শক্তির সংগীত
দেবুদা অর্থাৎ দেবু বোস
সবার প্রতিই তরু—বহুদূর ব্যাপ্ত ছায়া—ছবি
বিশাল রৌদ্রের ক্ষেত, জলাবাড়ী, হোগলা হিজল
নিপুণ যাত্রার-মাঠ, ভরাগাঙে বাঁধানো ঝুলপুল।
প্রথম দর্শনে আমি যা দেখেছি, তাই হয়ে খুঁজেছি বসতবাটী,
দ্রুত সব শেষ হয়ে যায়, বড় দ্রুত চাকা ঘুরে যায়!
মহিলার রূপ পড়ে, বেলা পড়ে ; লোকজনে বলে, সব অমনি—এ রকমই
এই ঘাটে এসে কেউ হয়নি তালগাছ।'

কে আর দেখতে চায় সমবেত ভুল, প্রথামত ভেঙে যেতে কুল!
কে আর দেখতে চায় বাগান নির্মূল হয়ে যেতে
কে আর অকথ্য শোনে ঢ্যাঙা মনুমেন্ট তলে পাথরের মতো থেকে চুপ!
নিজেকে খুঁজতে লেগে দেখেছি চাঁদীর কাঁচ পুরুই হয়েছে।
আমি এতটুকু হয়ে গেছি—এই এতটু—কু

নিজের চীৎকারও আর শুনতে পারি না। হয় বোবা নয় তো বা কালা।

পারিপার্শ্বিকের ভীড়ে সবই আত্মপ্রতিকৃতি, সবই শিশিরের শব্দ ঘাস থেকে খসা
মৃত্যুর সময় ছাড়া ফুলের ইঙ্গিত শুধু মহিলার প্রতিহতে কেনাকাটা হয়
নতুন বাজারে ; আমি কি রকম হয়ে গেছি
কি রকম যেন আছি
কখন কাঁদতে হবে, কি কথায় হেসে উঠ্‌তে হবে
নেই বোধ—নেই অনুভূতি
সভায় শোভন ঠিক ট্র্যাজেডির বিচারক যেমন মঞ্চের মধ্যে থাকে সভাপতি
চোখের ভেতরে শুধু দৃশ্য আর দৃশ্যান্তর হয় :

সোনাহাটী পরগণা, পাথর প্রতিমা গ্রাম, শিববাড়ী, সীমানার গাছ
বাড়ীঘরে ইদুর, সাপের গর্ত, পাশাপাশি বেজী ও পুলিশকুঠী—চার্চ
জীবন পৌঁছে দিয়ে যৌনের প্রায় কাছাকাছি
রহমান চাটুজ্জে ও প্রমথ ইসলাম, শিপ্রা, মমতাজ সেন
ঘোষণার মতো বলে : বাঁচাই বিষম দায়! কই আর আছি!!
কষ্টি পাথরের কাছে জেনে নিতে ন-পুংশক কিনা
দেবোত্তর মাটি নিয়ে খুন—ফৌজদারী।
যুবকেরা যুবতীরা
আপাদমস্তকে তুলে বিক্ষোভের কালবেলা বারবেলার হাটে
বড় গাছে সেঁটে দেয় ক্রুদ্ধ পোষ্টার :
এরা বাবার নিকট থেকে পেয়েছে বঞ্চণা
এরা মায়ের নিকট থেকে পেয়েছে বৈমাত্র্য আচরণ
ভাই বন্ধুদের থেকে জুটেছে জিঘাংসা আর এরা
বিবাহ করতে কেউ পারছে না, কেন না
কার বা গোহাল কেবা ধোয়া দেয়—কেবা মাগ্‌গীভাতা দেয়
পার্বণের কাল শুধু সুরু হয় অরণ্যেরোদন ভরা বসন্তে ও সমবেত গান
—ব্যথা পাওয়া পাখীদের মনোরম খেলা।

তবু, ভাঙা কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের যে যেমন বলে
চোখে ঠুলি পরে দেখে ; জীবনের আদিম প্রশ্রয়ে
চালতাফুল খুলে যাওয়া মেঘলাদিনেও হাসি
হেসে যেতে হয়, তাই সুখ মায়া জানে
সব মুখে কি রকম মায়া! সব চোখে কি রকম মায়া!!
সবাই এখানে একে সেলাই-ফোড়াই করে কাঁথা করে বেঁচে যেতে চায়!

সঙের সম্ভাব্য সব নাচ শেষ!
ভাবা গিয়েছিলো সব গাছগাছ বয়সের মেয়ে পুরুষের মধ্যে উদাত্ত হাসির
রোল পড়ে যাবে, ভাবা গিয়েছিলো লোকালয়
উৎসবে ফেনিয়ে উঠবে ধানভানা রূপসীর নামে গান বেঁধে
ভাবা গিয়েছিলো তো অনেক কিছু, হোলো কই?
শোনা হয়, এখন সমস্ত ভাঁড় কেঁদে অর্থ করে জীবনের।
আর যারা এরই মধ্যে আলাদা জাতির
বড় গাছ দেখলেই নাম লেখে, সিন্দুক দেখলেই কিংবদন্তীর কথা মনে করে
তাদের দুর্ভাগ্য এই নিজেরা নিজেদের কাছে সহনীয় নয়
প্রায়শই পড়াশুনা সবচেয়ে ক্ষতি মনে হয়।

আমি জানি, অতএব, হাল ছেড়ে দেয়াই সহজ
অনেক অনিচ্ছাকৃত অপরাধে, বাস্তবিক, আর আমি অনুতপ্ত নই;
মেডিকেল হল থেকে ঘুম কিনে এনে
মৃত্যুর বদলে দেখি স্বপ্নময় হয়ে গেছি, সমস্ত শরীরে
আমি প্রতিক্ষণে এক টান বোধ করি
ধানের তরফ থেকে হাসান মোল্লার প্রতি যেমন হৃদয়
কথা কয়—সমস্ত শরীর শব্দ ক'রে আত্মহারা হয় যেন কোন
বহমান মহিলার সহিত সঙ্গম জানা হলো
আর তদবধি এক কান্নার অতি নির্বাসন;
গোড়ালি মচকে যায় অতি সাবধানেও পা মাটিতে বাড়ালে
একটা একটা করে কাটা যায় হাতের আঙুল ছুঁয়ে দেখবার সাধ
হয়েছিলো বলে ঘাস বনপ্রজাপতি

এবং যুদ্ধের ক্ষত-মুখ থেকে রক্ত—অবসাদ আর মনে মনে বলা
ভেঙে পড়লে চলবে না, মুহ্যমান হলে চলবে না
এবং মরিয়া হয়ে বেঁচে যেতে আমি
শেষ যুদ্ধ ইতিহাস, রবীন্দ্ররচনাবলী, হিতোপদেশের গল্প, ইন্দোসংবিধান
নিছক জলের দামে কালেমের পথহাটায় নগদ নগদ
ডিম দোসা কফি খেয়ে ইর্ষাকাতর বন্ধুবান্ধবের চোখের ওপরে
ট্রামে পাশাপাশি বসে কোন এক রজত কন্যাকে
পোড়া-মা-তলায় পৌঁছে দেবো বলে বেচে দিয়েছি ও
শেষ বিদায়ের চুমু অন্ধকারে তড়ি ঘড়ি ঠোঁটে মুখে দিয়ে
হয়তো সম্রাট, ফুরফুর করে উড়ি দুঃখের ওপরে
বোয়মের শশা বীজ হ্যাঁচকা ডাকেই প্রাণে আনে, মনে হয়,
পাতালের মরা লোহা হাতে পড়ে গোমরা মুখ খুশি হাসিময়
না করে পারে না। বলি, নিজেকে শুনিয়ে

এর নাম বেঁচে বর্তে থাকা,
বুঝলে হে, একেই বলে আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকা

অথচ সমস্তক্ষণ কি এক অন্বেষণ, কী এক অস্থিরতা
ভয়ঙ্কর তোলপাড়, রক্তে বাজে প্রাঞ্জল প্রত্যাশা
মরামাঠ, চিটাধান, যৌনাঙ্গের অগ্নিপ্রস্তর মাইলস্টোন
সব ফেলে শূন্য হাতে হাজার হাজার মাইল খুঁজি
ঝাকানো উজ্জ্বল সুখ, পাতল রক্তিম ঠোঁট, ডাক দিয়ে ওঠা দুই স্তন
অথবা শংখ আর হাত—

নদীর অথবা কোন বহমান মহিলার চুল
উষ্ণ প্রস্রবন, রাত্রি অন্ধকারে যেন ভিন্ন ভাষাভাষী বোধ
প্রার্থনার মন্ত্রময় ঝাউ-এ ভরা ঝিঁ ঝিঁ

তুফান দুর্বোধ্য শব্দে পাল্লার জাহাজে
এপাড় বন্দর থেকে সে পাড় বন্দরে
সেও আছে

আমারই বুকের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে তুলে আছে

দেহ দিয়ে, বোধ দিয়ে রক্তমাংসময় এক শান্তি দিতে চেয়ে
অথচ, আমার
যত দূর যাওয়া হোলো সুন্দর জঙ্গল বাড়ী—দেশ
ঘাস আরো চার আঙুল বেড়ে গেছে হরিণের পায়ের আঁচড়ে
এরপর মানুষের আর পথ নেই
এরপর অনন্ত কালরাত
ঈশ্বর তোমাকে পথ দেখাবেন
ওঁ—ম্—মা !!!

তুলসী মুখুজ্জে, রেবা, বাসুদেব, রেবতী মাসিমা
সব কে কেমন আছো ?
দস্তানাটা খুলে ফেল না, আমি করমর্দন করবো
আর পারি, তোমার জন্যেই আমি ঘাস মুঠো আঁকড়ে ধরেছি—এই ছাখো—
নিজেই চোখ খুলি, দেখি :
সিঁড়িতে দৌড়ে ওঠে বিপুল সমস্ত হারা শ্রেণী
জেটিতে জলের শব্দ, হৃদয়ে রক্তের শব্দ, যেন এক চারণ কবিতা :
দোল খেলা—এর সাথে আর কোন খেলা—
এর কাছে ধান ক্ষেত, এর কাছে উতরোল মেলা।

নৌকো যেদিকে যায় স্রোত তার উল্টো পথগামী

নৌকো যেদিকে যায়, স্রোত তার উল্টোপথগামী
হাতে তলোয়ার, মুখে পিতামহ দেখতে পান তাঁর প্রতিকৃতি
আমি কি হ্যামলেট বনে গেছি
চারদিকে লোকজন—রীতিমত রাক্ষসী নগরী
কালো লকলকে জিহ্বা, সেক্রেটারিয়েট—দাঁত তেমন—আকাশ
ব্রীজ
আমাকে দাঁড় করিয়ে ভাটা ও জোয়ার হচ্ছে

জোয়ার ভাটাও হচ্ছে
যাকেই জিজ্ঞেস করি নতুন তারিখ বলে প্রত্যহ প্রত্যেকে
ক্যালেণ্ডার থেকে পৃষ্ঠা ছিঁড়ি বা না ছিঁড়ি
পা থেকে মাথা অব্দি রক্তচলাচলে শব্দ
শুভ-ো দিন শুভ-ো দিন
লিপষ্টিক মুছতে মুছতে গোধূলির রক্তহীন ঠোঁট
আর
হাওয়া হাওয়া বিষণ্ণ জিজ্ঞাসা
তুমি কি যাচ্ছই

এতবধি নিজ কারণেই আমি নদীকে নির্জন দেখে সঙ্গ দিতে গেছি
দেখিয়েছি বন্দরের লোভ—বাড়িঘর—ফুল পালঙ্ক
বিস্তর বসতী জুড়ে আরও কত কি
দেখিয়েছি নিম গাছ শালিকের উড়া উড়ি
তিতো ছায়াতেও উঠছে মঠমঠ বাড়ি
বাসযোগ্য নয় বলে কোলকাতার উচ্ছিষ্ট সন্ততি
স্বপ্ন ছাপে ভালোবাসা পেতে হবে; বাসস্থান হতে হবে তোমাকে রমনী
ঘুমপাড়ানির গানে জন্ম মৃত্যু অব্দি আত্মজীবনী
নিজের পরণ কথা
আরেকটু দীর্ঘ হলে বাদুড়েই ছিঁড়বে শেফালী
আমি আর তুমি
তেমন তৃষ্ণা নদী সমান্তরাল
অথচ সঙ্গম চাই, নুন সম্পদের গান মাটিতে সবুজ বুনে স্বরলিপি করার আগ্রহে
নতুন বেহাগ বাঁধে পাখীর আভায় চাঁদ শাদা বেহালায়
আমার তুফান তুমি কখনো দেখনি, আমি চাঁদ নই, শিশিরের ঠাণ্ডা স্রোত নই
রূঢ় রৌদ্রে নুন রক্ত এবং সীমানা নিয়ে মৃত্যু জীবনের মধ্যে প্রতিমা লড়াই
মানুষের কাছ থেকে অন্য কোন অঙ্গীকার নাই
মানুষের কাছ থেকে যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাই
হৃদয় দেবার সর্ত

বুঝি
বুঝি তবু আমি কী যে করি
নৌকো যে দিকে যায় স্রোত তার উল্টোপথগামী
যাকেই জিজ্ঞাস করি নতুন তারিখ বলে, ঘড়িটা আমার চেয়ে দামী।

একদা মানুষ ছিলো এমন পাথরে

কাঁটায় কাঁটা ঘর্ষিত রাত্তির বারোটা
ইষ্টিশানে দাপায় এঞ্জিন
তেমন বাসর ঘরে নববধূ প্রতীক্ষায় বর
ঘুম ঘুম দীপ জেলে নির্জন শহর

হাওয়া হাই দেয়, বনঝাউ কাঁপে, পাখায় জড়ায় খড়
পাখীরা শ্মশানেও যায়
সকাল পেলেই খুশি হয়,
সকলেই কোথাও চলেছি···দ্রুত···
ট্রেন কি হঠাৎই দিলো সিটি

ষ্টেশান তুফান দেয়, জীবন চালাতে ব্যস্ত গুপ্তী লাঠিসোটা
বেঁচে থেতে অসংখ্য রুটিন
সবারই সমস্যা শুধু ঘর
রক্তের ফেনায় ছাপা সংসারের স্বপ্ন, আর, বুকে পূর্বপুরুষের স্বর

চোখের জলেও পড়ে বালি···
ভেঙে ভেঙে বুজে গেছে নদী
খোঁড়ো যদি পাবে
একদা মানুষ ছিলো এমন পাথর
সমস্তেই তলিয়ে চলেছি

শিশিরের ভারে ছিঁড়ে ঝরছে শেফালি
দেখুন, হোটেল আছে, শহরে যেখানে চলে ওঠা?

মানুষ সমুদ্র হয়ে যাবে

আমার জেগে থাকলে কাঁদতে ইচ্ছে করে
আমার ঘুমুতে ঘুমুতে দেহ অবশ হয়ে যায়
বুকের ওপর হাত রাখলেই বিশ্রী স্বপ্ন দেখি
মানুষেরা হাঁটু গড়ে দানবের কাছে প্রার্থনা করছে
দয়া করে তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখো
তরোয়াল খোলা দেখলেই আমাদের রক্ত কাঁপতে থাকে
বোমা পরীক্ষার কথা শুনলেই
মনে হয় সন্তানের মুখ
দেখো
ঠাকুর এবং কুকুরের রেশন কার্ডের দরবার করে
অনেকেই ক্লান্ত হয়ে ফেরে
ভালোবাসার কথা শুনে শুনে কানে ঘা ধরে গেছে অনেকের
এ সত্যি
আর এও সত্যি
গন্ধ দিয়ে এখন আর গোলাপকে গোলাপ জানা অসম্ভব
বাড়িতে কৌতর থাকলে গেরস্থালী অশান্তির নয়
হয়না এমন

আমার চশমা হারিয়ে যাবার পর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
মানুষের ভাব আছে আমার মধ্যেও
সারাক্ষণ বুকের মধ্যে ছবি আঁকা হচ্ছে
আন্তাবলে আগুন লাগলে বিশাল খুরের শব্দ
তেমন বুকের

দয়া করে তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখো
এর চেয়ে ভালো সকালের ছবি ম্যাডোলাও হয়নি
উদীপরা সৈনিক তার সন্তানকে আদর করছে
শিউলী ফুল কুড়িয়ে মায়ের আঁচলে রাখছে বালিকা
আর
এও সত্যি
নদী যতক্ষনে সমুদ্রে পৌছাবে
মানুষ সমুদ্র হয়ে যাবে ॥

কালো রোদ-এ ভরে ওঠে নীড়

অসুস্থ বুঝেই খুব হাত কাঁপা সুরু হোলো
বুকের বাজনার শব্দে শোকগাথা অনুভব
মাথায় বন্যার রক্ত ঢুকে পড়ে, নোনা নষ্ট চাঁ
বাড়ি ভাঙে ভাঙে, চোখ চাঁদা মাছ
তুমি কে, সমস্ত মুখে ঈশ্বরের আঁক
দৈব-বাণীর মতো মনে পড়ে এক একটা কথা
উপস্থিতদের কাছে ধাঁধাঁ বলি উদাসীন দূরত্বের থেকে
হয়তো যন্ত্রণা হচ্ছে
এর পর পৃথিবীর যবনিকা বুঝি
আঘাতের গভীরতা, ইত্যাহার ক'রে দেই
চোট বোঝ সমস্ত পৃথিবী
রক্তের শত্রুকেও আলগোছে হেসে বলি বারবেলা রোদে
সবকিছু রয়ে গেলো
নির্ঘাৎ বুকের মধ্যে তোমারও ডুকরে উঠবে
চোখে মুখে ফুটে উঠবে সংবাদের ভীষণ আগ্রহ
সীমানার বেড়া ভেঙে দু বাড়ীর রাস্তা হয় কিনা
—না না আপত্তি কোরো না!

ঠোঁটে কমলা লেবু খুলে দেবার হাতের প্রতি ক্ষোভ
পাতায় বাতাসের শব্দ সংলাপ সংলাপ
পৃথিবী উস্কে মায়া জাগানো তো হোলো
তুমি কেন এমন কুয়াশা
ভালোবাসা, কেন তুমি এমন পিপাসা—তুমি কেন—
জানালার কাঁচে পড়ে ফেরিয়ালা বাড়ি ফেরানোর ছিট-ছিট রোদ
কালো রোদে ভরে ওঠে নীড়—নির্জনতা—মন্ত্র পাঠ
শিশির ঝিঁঝির নীল নক্ষত্রের স্বগত উক্তির
শব্দ
ওঁ মা।

ভাঙা ভালোবাসা নরক ভাবোনি

ভালোবাসাগুলো বাড়ি ভেঙে পড়ে গেছে
পাখী তছনচ খড়, আসবাব, পোষাক-আসাক পোষা ছবি
ঘটা করে তুমি মাছমাছ চোখে তুলে
তলিয়ে যাচ্ছো কোথায় বাল্যকালে

লুকোচুরি খেলা সিঁড়ির কানাচে : কুহু কুক কুক কুহু
স্বর খুবই চেনা, দূরত্বও তো জানা, ইটে ইটে কাঁচা হাতের লেখার দাগ
বাগান দাপিয়ে, তেমন ভ্রমর, হাওয়া পায়ে পায়ে ফিরে
ছাতে উঠে দেখা আকাশ যায় না ছোঁয়া

চিল থেকে নেমে খিলানে রাত্রি, পোষাক ফিরিয়ে তুমি
আয়নায় আর নিজেকে পাওনি, দেখেছো বকুল বন
বাইরে শুনেছো কোন পাখী কাঁদে : পিউ কাহা পিউ সা গা রে গা মা
ভালোবাসা তুমি ছবি করে রেখেছিলে

ভালোবাসা ভাঙা পলেস্তারায় ছাদ থেকে নামা হাত
কাঁচভাঙা, খড়, পাখী তছনচ, আসবাব, পোষা ছবি
দেখলে, কেমন লাগলো বল তো—
বিরহ প্রহরী আমাকে দেখাও, সুখের কথাই,

ভাঙা ভালোবাসা নরক ভাবোনি, নিদেন ভেবেছো, হারিয়ে পড়েছি আমি।

তৎসম সবিতা

পাখীরা কুলায় ডানা মুড়ি দিয়ে খুশি হয়, ডুবে যায় চোখে লাগা দৃশ্যের ভেতরে
ঘাসের ভেতর থেকে মুখ তুলে দেখা গিয়েছিলো
বিস্ময় মেনেছে মেয়ে স্তন উঠছে দেখে, তার রক্তের উষ্ণতা
বসন্তের বৈভব দিয়েছে, নাকি, সম্ভাব্য স্বপ্নের মতো কাঁচা অঙ্গে ধরেছে বউল
শিশির ভাঙার শব্দে উচ্চকিত মুক্তোময়ী নীলাভ ঝিনুক
সমুদ্রের,—নুন সম্পদের
আয়োজনে খুলেছে উৎসব
নীলপরী সবুজ পরীরা রোদ-এ নাচগান দিয়েছে, লেগেছে ভাব
বন্দরের প্রথম সূর্যের ;
এ নিয়ে আলাপ কেটে পাখীরা খুঁজেছে ভালো খড়
তারা ভালোবাসা মানে বুঝেছিলো বাড়ি
তারা সন্ততির জন্যে গলা ভরে নিয়েছিলো ধান
বালিকাকে উড়ে উড়ে তারাও শুনিয়েছিলো ও শরীর মানুষের ভালো বাসস্থান

লোকালয়ে নারী পুরুষের উষ্ণ রাত্রি দুপুরে
প্রেমে আর্দ্র নক্ষত্রের আলোকের হিমে
মরে যেতে ইচ্ছে চায় শিউলী আপন গন্ধে আমার বাগানে
অভ্যাস বজায় রাখতে অনন্ত খুরের শব্দ বুকে বুকে বিশাল ঘোড়ার
কঠিন

কঠিন
কতদিন
স্থগিত শানের রাস্তা খুলে দিতে তৎপরতা জনপ্রতি চোখে
অতএব কৃষ্ণ সূর্যের দেশ থেকে ছুট—ছুউউট্
তেমন দ্রুততা আছে রক্তের শরীরে
ছুটে ছুটে একই বৃত্তে আমার পাগল হতে বাকি
আত্ম উদ্ধারের পথ রূঢ় অন্ধকারে লুপ্ত, মাথায় জোনাকী
কে ডাকে ওখানে? নাম—আমার নামের শব্দ পাঁচিলে আচড় কাটে নাকি
ওখানে কিসের শব্দ, ঘাসে ঘাসে শিউলীর পতন
রোম—শ্রাবন্তীর স্বপ্ন—কিশোরীর বেলা পড়ে বুঝি
পাখীরা রোমাঞ্চিত ডানা নাড়ে
দৃশ্য পরিবর্তনের বেহাগ বাজছে যেন কোথা

রাত্রির তর্জমা হয়ঃ মুখময় সজীব প্রতিভা
শিশিরের কারুকার্যে দেশ নদী—ধানে দুধ ধরেছে ; দুয়ারে
রক্তের বিশ্বস্ত নারী
তৎসম সবিতা।

কবিতাবলী

পরেশ মণ্ডল

মুখোমুখি অন্ধকার

হাওড়া ব্রীজ দুলে উঠলে বুকের মধ্যে ভূমিকম্প
ট্রামের মধ্যে আলোর ভেতর মুখোমুখি অন্ধকার
হুগলী নদীর জলের ওপর ছায়া কাঁপছে চোখের পাতার মতো
গোপনতম উষ্ণতায় মুখের ছবি
ম্লান হয়ে যায়
সর্বদাই জলাতংক সারাদিনটা শয্যাযায়ী
অন্তপারে ঘূর্ণিবাতাস
মরুভূমি মৃত্যুর নাম জ্যোৎস্না এবং রক্তের দাগ

তৃতীয় ভুবন

আলোর এপাশে তার ঘর ছিল
আলোর এপাশে তার স্মৃতি ছিল।

আগন্তুক চারিভিতে, অতিথির মতো
সলজ্জ, জড়িত।

পুনর্বার বৃষ্টি এলে,
পুনর্বার অসুস্থ উত্তাপে
মুগ্ধ হতে পারি।

.....এবং দশটি পাখি ও নীল বাতিটা

.....এবং

দশটি পাখি প্রোজ্জ্বলিত নীল বাতিটার দিকে
উড়ে যাচ্ছিল।
হঠাৎ কুয়াশা এসে তাদের নরম লাল ঠোঁট
স্পর্শ করতে
বাতির শিখাটি এক গভীর ক্ষতের মতো দুর্বোধ্য ও
বিভীষিকাময় মনে হলো,
ডানার চঞ্চল শব্দে তরঙ্গ—তরঙ্গ
স্থির হতে হতে দূরে চোখের দৃষ্টির চেয়ে জটিল আবর্তে
মিশে গেল।
এবং
দশটি পাখি প্রোজ্জ্বলিত নীল বাতিটার দিকে
উড়ে যাচ্ছিল।

ঘরের নিমগ্ন কোণে

সারারাত বৃষ্টি হয়েছিল,
তবুও রাস্তার ধারে তিনটি আলো জ্বলেনিকো আর
গন্তব্য হারিয়ে ফেলে স্বভাবত একটি পাখির ছায়া
দর্পণেই খুঁজেছে আশ্রয়।
আকাশে এমন কিছু ঘনঘটা ছিল না সেদিন
কোনো এক বান্ধবীর জন্মদিন ফেলে রেখে ঘরের ডুবন্ত কোণে
বড় বেশি আপনার মনে হয়েছিল
নিজেকে নিজের।

প্রতিবিম্ব

একাকী
জলের
মধ্যে
প্রতিবিম্ব
চারিদিক
স্তিমিত
লজ্জার
মূঢ়
বিকেলের
দীর্ঘ
ছায়া
খেলা
করে
রক্তহীন
নিরালম্ব

দীর্ঘশ্বাস

আমি সেই সমুদ্রের তীরে যাবতীয় কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম ইচ্ছা ছিল প্রসারিত চোখে ইচ্ছা ছিল সুবিনীত ইংগিতে নীরবে আন্দোলন গুণে যাবো ঝড়ের ভৈরব মূর্তি সহৃদয় পতাকার উজ্জ্বল স্পন্দন সমর্পণ সব রেখাগুলো স্পর্শ পাবে প্রতীক্ষার দরজার প্রতীক্ষার জানালার অন্তরালে আকাশের নিচে বা ঘাসের নিচে যেখানে শব্দগুলো শব্দহীন স্তিমিত বা স্থিত পড়ে আছে ঘুমন্ত শিশুর মতো অচৈতন্য অন্ধকার অন্ধকার নেমে আসতে চায় আমি সেই সমুদ্রের তীরে যাবতীয় কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে ছায়ার মতন দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘশ্বাস

বাধি

মৃত্যুর সীমানা ছুঁয়ে
সে তার হারানো ছবিটা ফিরে পেল

গোপনীয়

অবশ্য পাঁচটি ফুলে—এবং ফুলের নীল জ্যোৎস্নার ভিতর
স্বেচ্ছাচার বেড়েছে কেবল।
গোপনে
নর্মদা যেন—গোপনীয়—আরো
গোপনীয় হতে চায়।

গন্তব্যের দিকে

পাশাপাশি যেতে যেতেই ফুরিয়ে গেল বেলা,
পাশাপাশি যেতে যেতেই……
মন্দির কই মন্দিরের চূড়া বা কই
অস্তগামী সূর্যে প্রতিফলন
নৌকাডুবি হয়ে গেছে তাই কি ভুরু কাঁপে
সন্ধ্যেবেলা পৌঁছে যাবো নিশুত ঘরে
এপার ওপার চোখ বুলিয়ে শূন্যে কেমন খেল!
দেখতে পেলাম অনুভবে পাথর থেকে পট
শব্দও নেই শান্তিও নেই কৌশলে তার অলংকৃত দেহ
কণ্ঠস্বরে আড়ষ্টতা শুভ্রতাকে অন্য নামে ডাকবো বলে
হারিয়ে গেলাম
পাশাপাশি যেতে যেতেই ফুরিয়ে গেল বেলা
পাশাপাশি যেতে যেতেই……

রহস্যময়

নির্বাসিত বিড়ালের চোখের মণিতে সেই গভীর রহস্য
মনে পড়লে
জানালাগুলো বন্ধ হয়ে আসে

মাছরাঙা

শুকনো পাতার ঠোঁটে
সূর্যের
নখের
দাগ
মুছে গেল বলে
বিবর্ণতা
মাছরাঙা পাখিটাও
উড়ে গেল
দুপুরে
কোথাও

সমীক্ষা

অবিশ্বাসী হৃদয়কে ছলনার মতো মনে হয়

প্রার্থনা

কাউকে ডাকি নি
তবু
কেন মুখ বাড়ালে জল্লাদ
তবু
কেন মুখ বাড়ালে ঈশ্বর

আমাকে আজ একা থাকতে দাও

মানচিত্র

এখানে নদীর স্মৃতি
সীমানা
হৃদয়
অক্ষরেখা বরাবর
ছায়া
মন্দির
এবং
রাত্রি
জ্যোৎস্নাময়

অতঃপর

আসলে জন্মের পর আমরা কেউ নিজেদের মুখও দেখিনি
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে
মমতাময়
অন্ধকারে

নেমে
বেশ করে নিঃশ্বাস নিয়েছি
এইসব ছবি দেখছিলাম
স্বপ্ন দেখছিলাম   সারারাত বৃষ্টি হচ্ছে
আর
আমরা কজন যুবক
হাতের রেখায় ভরা
আয়নাটা
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
যেন কেন্দ্রস্থল পেয়ে গেলাম
অতঃপর
স্নানযাত্রা
নববর্ষ
ইত্যাদি

সংকেত

পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে
রোজ সেই কথা
সেই সব ছবি
মনে পড়ে
সেই নীরবতা
পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে
রোজ সেই কথা
সেই সব ছবি

পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে

আলোকস্তম্ভ

পেষা খরগোশটা চুপাস্বের নিচ থেকে গলে যায়
মনে থাকে না
খরগোশের চোখে বৈদ্যুতিক হাসি জটিলতা
মনে থাকে না
শেষ ট্রামে চলে গেলে পেছনের লাল আলো জেগে থাকে
টার্মিনাস
স্বপ্নের মধ্যে অগুনতি পেন্সিল পেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস
রোমাঞ্চ
ইলোরার মন্দিরে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
অতীত নিসর্গ
অস্পষ্ট ছবির বোবা আকাঙ্ক্ষা ঠোঁটে প্রতিলিপি উচ্চারণ
আলোকস্তম্ভ

গলির অন্ধকারে

গলির অন্ধকারে
চেনা গলায় কে যেন ডাকল
ঘুম থেকে জেগে
মনে হয়
কে যেন এখন……
কি যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে
গলির অন্ধকারে
সীমাহীন আলো
যেন বা ছিল
এখন নেই
গলির অন্ধকারে

এবার আমি

এবার আমি মুখ লুকোবো রৌদ্রে
এবার আমার নামের পাশে ছায়া
এবার আমি মুখ লুকোবো রৌদ্রে

টেলিগ্রাফ পোস্ট

রেললাইনের পাশে
টেলিগ্রাফপোস্ট
কোমরটা ভাঙা
প্যাথেটিক
এদিক থেকে ওদিক থেকে
বাতাস
ঠোঁট
উত্তাপ

পেণ্ডুলাম

দ্বিতীয়ার চাঁদে আকাশে বন্যা
খোঁড়া পায়ে হাঁটে ঘোড়া
পেণ্ডুলাম

ছোট্ট স্টেশন জনহীন
ওভারব্রীজের ওপরে আলো
সিগন্যাল

জাহাজ এখন পোতাশ্রয়ে
সমুদ্রে কালো সাইক্লোন
টেলিভিশন

সমীক্ষা

বিছানা পেতেই মনে হলো তার
ঘুমের কথাও বিড়ম্বনা
বহুকাল আগে
চিঠি লিখবার
কথা ছিল
আর

পঁচিশটি শয়তান

আমার কাছে আত্মগোপন করে আছে পঁচিশটি শয়তান
তাদের নখের মধ্যে বিষ হাতের তালুতে চক্র
চোখের গর্তে রহস্য
যখন অন্ধকার কেটে যায় গোপন অন্ধকারে
যখন শব্দ হয় স্তম্ভিত বেতারে
যখন বন্ধ হয় শ্বাস
মুহূর্তে বিস্বাদ
তারা বেরিয়ে আসে ক্ষুধায় মন্বন্তরে
আমার কাছে আজ এখন তারা
আত্মগোপন করে আছে।

মোহনায়

দেয়াল পুরনো হলে রহস্যময় ছবি ফুটে ওঠে
স্মৃতিচিহ্ন রক্তের নদীতে পা ডোবায়
নিজেকে স্পষ্ট চেনা যায়।

কে তুমি সর্বস্ব হারিয়ে এমন সম্রাট হয়েছো?

এক দুই তিন……ঘণ্টা বাজে
জন্মের প্রথম দিন যেমন বিস্ময় মোহনায়।

ইন্দ্রজাল

যাদু দেখতে দেখতে
হলময় বিস্ময়
বিস্ময় থেকে ইন্দ্রজাল
মুখের ওপরে হাত
হাতের ওপরে চোখ
চোখের ওপরে ভ্রূ
ভ্রূ ছাড়ালে কপাল
তাতে লেখা ভবিষ্যৎ
কোন দিন মৃত্যু হবে
পরজন্ম
মৃত্যু
জন্ম
মৃত্যু।

রাডারে সংকেত

১
রাডারে সন্ত্রাস
আচমকা মেঘ, ছুটন্ত ঘোড়া, অভিসম্পাৎ,
'শেষবার ক্ষমা কর'
নতজানু প্রার্থনা!

২
খেলার বলটা লোফালুফি করে ছেলেরা
এখন
বৃদ্ধ সময়, ভাঙা কাপ, দূরবীণ,
সংকেত।

জোনাকিরা

জোনাকিরা খেলা করে
আলো
অন্ধকার
আলো

ছফুট লম্বা পোস্টের ছায়া কাঁপছে
কাপের চায়ে ধোঁয়া
হিজ-মাস্টার্স ভয়েসে সানাই

জমাট শীত অদ্ভুত স্বপ্ন
ফুটপাত
জোনাকিরা

গীটার

ঘরের কোণে পুরনো গীটার
ছেঁড়া তারে জং
বাঁকা রোদ
ধুলো
ছাদের টবে রজনীগন্ধা
পুরনো গীটার
ঘরের কোণে
গীটার

ডাক দিলে তুমি

শান্তিকুমার ঘোষ

ডাক দিলে তুমি বয়ঃসন্ধি থেকে
ঘনায় অসুস্থ তৃষ্ণা শিরায় আমার
মেলার বিষম ঘুরন্ত কাঠের ঘোড়া
এখন বন্ধন কেবল আমার হাত
আমারই অন্য হাতের মধ্যে
তুমি ডাক দিলে কেন বয়ঃসন্ধি থেকে
ক্ষিপ্র ঝলসিয়ে-ওঠা উলঙ্গ কৃপাণ!

আভার দূরত্বে তুমি
আনত কুমারী মাথা
যেন গান গাইবার জন্য বাড়ানো ঘুঘুর কণ্ঠ
সামনা সামনি এলে
হাঁটু দুটো আমার বঙ্গোর মতো বাজে।

কালো পাথর

অঞ্জন কর

চোখের দু'পিঠ আগুন লেগে ঝল্‌সে গেছে কোন কিছুরই মুখ দেখিনা
মুখের মতো পরিপাটি হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় না-কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে
বারুদে হাত দিয়েই স্বপ্ন দেখার কথা ভেবেছিলাম—
এখন আমার চোখ পুড়েছে, চোখের দু'পিঠ নিকষ কালো
হৃদ্‌পিণ্ডের পাঁজরা-ফুলে জং ধরেছে ঘুনের মতো—ছাড়াতে চাই
ছাড়তে গেলে হৃদয় কমল জুড়ে এখন উপরে আসে—পাখীর ডানার নিস্পৃহতা
জলের স্বচ্ছ মুকুরে হাত জীবন ভরে জাড়িয়ে রাখা
গানধরা সেই ভোরের পাখীর আনমনা নিকুঞ্জলতায় হারিয়ে যাচ্ছে—
হারিয়ে যেতে মন রোচে না
মনের মধ্যে গান ধরা সেই ছোট্ট পাখীর আকুলতা এখন অতীত···
আগুনে হাত দিয়েই আমি ফুঁ দিয়েছি জীবনটাকে নির্ভয়ে দেবার

তুমিই আমার ভাগ্য এবং বিফলতা কিংবা বিরাট সর্বনাশের অঙ্গুরীয়
তাড়িয়ে নিচ্ছো নদীর কূলে কূলেই আমি হারিয়ে যাচ্ছি—
বুকে উড়ছে গাঙের বালি· জিভের ডগা কামরে ধরছে অবিশ্বাসের মতোই
ব্যাপ্ত ধুলো কাঁকড়
যেনো সারা শরীর জুড়ে ধরিয়ে দিচ্ছি অ্যাসিড মাখা রক্ত বমি
চামড়া ত্বকে লাগছে আগুন—চোখের দু'পিঠ পীচের মতোই ঝরছে গলে
অন্ধকারে হাত মেখে যায়—কালোপাথর নিয়েই আমার পথের সূচি!

তুমি আমার রাইকমল

শংকর দে

বাসিন্দাপল্লীর পুকুরের জলেই দেখছিলাম
রাইকমল, প্রায় আক্ষরিক অর্থে চাঁদ ও বিবাহের স্বপ্নে
তোমাকেই দেখেছিলাম, রাইকমল, আজ সুকেশিনী
উন্মনার পথেই মিলিয়ে থাকা দুদিকের চোখেই আজ ভাসমান
আমার অতীতের পল্লী ও মাধবীলতা, এ সবেরই ভুল
মনের তুলনায় তোমাকেই বলেছিলাম, তুমি আমার রাইকমল।

বৈরাগ্যেরই সিংহদৃষ্টি

শংকর দে

শিকারের পথেই প্রথম যাওয়া হলো অনর্পিত কুঠার।
এইভাবেই অঙ্গচ্ছেদ, চোখে নয়, জঙ্গলে প্রথম পায়ে পায়ে
ভূমধ্যকেশরী, দীর্ঘ বৈরাগ্যেরই সিংহদৃষ্টি—
জেলে দেখাই প্রথম মন্ত্র জেনে, শিকারের তাঁবুতেই আজ
অশ্রুসার, নিজেরই কুঠারী।

এম. এ. পরীক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি অপরিহার্য গ্রন্থ

সাহিত্য সরণী। গৌরাঙ্গ ভৌমিক রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

[উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উচ্চ প্রসংশিত]

আলোচ্য বিষয়ঃ (১) বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা, (২) বাঙলা সাহিত্য ও হিন্দু বৌদ্ধযুগ (৩) চর্যাপদ, (৫) জয়দেব : বাঙালির কবি (৫) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (৬) বাইশ কবির মনসামঙ্গল, (৭) গোপীচন্দ্রের গান। আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিকদ্বয় সম্ভাব্য সমস্ত দিক সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। দাম : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সারদা-মঙ্গল। বিহারীলাল চক্রবর্তী। গৌরাঙ্গ ভৌমিক সম্পাদিত

ভূমিকায় বিহারীলালের জীবন, পরিবেশ, মানসিকতা, রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত, লিরিক কাব্যের ধারায় তাঁর স্থান আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া সারদা-মঙ্গলের কথা-বস্তু, উনবিংশ শতাব্দীর মানসিকতা, রোমান্টি-সিজমের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ, মিষ্টিসিজম, বিহারীলালের সারদার স্বরূপ, বিহারীলালের কবিসামর্থ, পরবর্তী কাব্যে প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদক বিশ্লেষণ করেছেন। বোর্ড বাঁধাই-সুদৃশ্য প্রচ্ছদ!

দাম : দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অভিসার : ঘরে বাইরে। অধ্যাপক রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ)

দেশী-বিদেশী রোমান্টিক কবি ও কাব্যের ওপর বিদগ্ধ আলোচনার গ্রন্থ। বাঙলা ভাষায় এ জাতীয় বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা। গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, চতুরঙ্গ, জীবন স্মৃতি, মানসী, রাজা, সোনার তরী, চিত্রা ও শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের ওপর সুদীর্ঘ আলোচনার গ্রন্থ। ছাত্র, অধ্যাপক, পাঠাগারের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। তপনলাল ধরের আঁকা সুদৃশ্য প্রচ্ছদ। জ্যাকেট বাঁধাই। দাম : ছয় টাকা।

পরিবেশক : অ্যাকাডেমিকা ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা ১২

অনুভব [ত্রৈমাসিক কবিতাপত্রিকা] বর্ষ ২ সংখ্যা ২ ক্রমিক সংখ্যা ৬ কার্তিক ১৩৭৪
ANUBHAV (Poetry Qly.) Vol. 2 No. 2 Sl. No. 6 PRICE Rs. 2·50

কবিতা কি, কেন ইত্যাদি প্রশ্নাকীর্ণ জিজ্ঞাসার সদুত্তর বোধহয় এ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেননি, হয়তো দেওয়া যাবে না কোনোদিন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবিতার চেহারা যেমন প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে, তেমনি কবিতা সম্পর্কে গৃহীত প্রাচীন সিদ্ধান্তসমূহও পুনর্গঠিত হয়ে চলেছে ভেতরে। অনুভব কবিতা প্রচার পুস্তিকামালায় মূলতঃ একালের কবিদের কবিতাগুলিই নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। হয়তো এইসব কবিতায় কবির স্বকালীন চিন্তাধারার সঙ্গে চিরকালীন মানুষের হৃদয় বেদনারও সংবাদ সংযোজিত হয়ে চলেছে। এই পুস্তিকামালায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে—

১. হে অগ্নি, প্রবাহ / রাম বসু
২. এখন সময় নয় / শঙ্খ ঘোষ
৩. আমার হাতে রক্ত / কৃষ্ণ ধর
৪. অস্থিমজ্জা মাংস ইত্যাদি / শান্তি লাহিড়ী
৫. নীলকণ্ঠ পাখির সময় / সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৬. এ যেন বারবেলা / সত্য গুহ
৭. প্রতিবিম্ব / পরেশ মণ্ডল

প্রতিটি পুস্তিকা ষোল পৃষ্ঠার। এবং প্রতিটির দাম মাত্র পঞ্চাশ পয়সা।

সম্পাদনা করেছেন : গৌরাঙ্গ ভৌমিক

প্রাপ্তিস্থান : **সিগনেট বুক শপ** কলকাতা বারো

Editor : GOURANGA BHOWMIK
Published by Debkumar Bose from 19, Panditia Terrace, Calcutta-29 &
Printed by Nirmal Kr. Paul at Nirmal Mudran 8 Brojodulal St. Cal-6.
এ সংখ্যার দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা